অস্তিত্ববাদের স্রষ্টা

সোরেন কিয়ের্কেগার্ড

গোলাম ফারুক

অদ্ভুত, বিষণ্ন এক পরিবারে জন্মেছিলেন সোরেন কিয়ের্কেগার্ড। অনেক ভাই-বোন কিংবা স্কুলের সহপাঠীদের মধ্যে থেকেও নিঃসঙ্গ থাকতে বাধ্য হয়েছিলেন। বেঢপ আকৃতি ও কিম্ভূত পোশাকের জন্য সহপাঠীরা প্রায়শই উত্যক্ত করত তাঁকে। ভাল জামা-কাপড় পরে কিংবা গায়ের জোরে যে ওদের মোকাবিলা করবেন, বাবার কড়া শাসন ও শারীরিক অসুস্থতার জন্য সে উপায়ও ছিল না। বাইরের নিষ্ঠুর জগৎ ও বাসার বিষণ্ন পরিবেশের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে 'অস্তিত্বশীল' থাকার জন্য দুটো মাত্র অস্ত্র ছিল হাতে—বোধশক্তি ও কল্পনা। জীবন-যুদ্ধে টিকে থাকার জন্য এদেরকেই শানিয়ে নিলেন। ধীরে ধীরে বোধ আরো প্রখর হল, ব্যপ্ত হল কল্পনা। শুধু ছোটবেলায় নয়, সারা জীবন এই হাতিয়ার ব্যবহার করেছেন সোরেন। নিজের বিষণ্ন পরিবার কিংবা স্কুলের সেই ছেলেরা, বিদগ্ধ সমালোচক কিংবা বিশপ মার্টেনসন—প্রতিদ্বন্দ্বী যে-ই হোক তাঁর হাতে বারংবার ঝলসে উঠেছে এরা।

পরবর্তী কালে যখন হেগেল প্রমুখের মতো প্রবল প্রতাপান্বিত বুদ্ধিবাদী দার্শনিকদেরকে বা দিনেমার মনোজগতে অনড় আসন গেড়ে বসে থাকা প্রচলিত খ্রিস্টধর্মকে আক্রমণ করেন তখনো সম্বল ছিল এই বোধশক্তি ও কল্পনা। জ্ঞান, বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা নয়, চিরকাল তিনি ব্যক্তিমানুষকে আশ্রয় করেছেন, বাস্তব জীবনকে প্রত্যক্ষ করেছেন এবং তাঁর 'গুরু' সক্রেটিসের মতো নিজ-অস্তিত্ব নিংড়ে সৃষ্টি করেছেন যুগান্তকারী দর্শন—অস্তিত্ববাদ।

অস্তিত্ববাদের স্রষ্টা
সোরেন কিয়েৰ্কেগার্ড

গো লা ম ফা রু ক

আজিজ কো: সুপার মার্কেট
শাহবাগ, ঢাকা, ফোন:

অবসর

প্রথম প্রকাশ : ফেব্রুয়ারি ১৯৯৯

অবসর প্রকাশনা সংস্থা ৪৬/১ হেমেন্দ্র দাস রোড, সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০'র পক্ষে এফ. রহমান কর্তৃক প্রকাশিত এবং নিউ পুবালি মুদ্রায়ণ ৪৬/১ হেমেন্দ্র দাস রোড সূত্রাপুর, ঢাকা-১১০০ কর্তৃক মুদ্রিত।

প্রচ্ছদ
মানবেন্দ্র সুর

মূল্য : ৭৫.০০ টাকা মাত্র

ISBN 984 - 415 - 093 - 0

SØREN KIERKEGAARD : THE FATHER OF EXISTENTIALISM by GOLAM FARUK
Published by ABOSAR, 46/1 Hemendra Das Road, Sutrapur, Dhaka-1100
First Edition : February 1999 Price : Taka 75.00 Only

একমাত্র পরিবেশক : প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা
বিক্রয়কেন্দ্র : ৩৮/২ক বাংলাবাজার (দোতলা), ঢাকা-১১০০

উৎসর্গ

স্নেহান্ধ দুই অগ্রজ
ফিরোজা মুনীর
ও
শাহেদা রহমান-কে

সূচিপত্র

ভূমিকা নয়

কোপেনহেগেনের বুড়ো খোকা ১
আমার অস্তিত্ব বিপন্ন ৯
'আমিই সত্য' ১৯
রেগিন ওলসেন ২৬
অতলান্ত গহ্বর ৩৪
খ্রিষ্টধর্ম ৪২
জীবনের তিনটি স্তর ৫১
শেষ কথা ৬৬

পরিশিষ্ট ৭১

সোরেন আবে কিয়ের্কেগার্ড : গ্রন্থপঞ্জি ৭৮
সহায়ক গ্রন্থপঞ্জি ৭৯
নির্ঘণ্ট ৮১

ভূমিকা

১

আমি দার্শনিক নই, তত্ত্বজিজ্ঞাসু মাত্র। কোনো দার্শনিককে পুরোপুরি মৌলিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করে পাঠকদের সামনে যে উপস্থিত করব সে ক্ষমতাও আমার নেই। আমার উদ্দেশ্য খুব সামান্য : সাধারণ পাঠক, যাঁরা দর্শনশাস্ত্রে সুপণ্ডিত নন, তাঁরা যেন বিংশ শতাব্দীর সবচাইতে উল্লেখযোগ্য দর্শন 'অস্তিত্ববাদে'র স্রষ্টা সোরেন কিয়ের্কেগার্ড-এর চিন্তাধারাকে নিজেদের জীবনবোধের সঙ্গে মিলিয়ে নিজ-অবস্থানকে স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করতে পারেন সেদিকে প্রণোদিত করা।

এই বইয়ের মূল প্রতিপাদ্য যেহেতু অস্তিত্ববাদ তাই এখানে আর সে প্রসঙ্গে না গিয়ে কেন আমি অন্য অস্তিত্ববাদীদের বাদ দিয়ে বিষয়বস্তু হিসেবে সোরেন কিয়ের্কেগার্ডকে বেছে নিয়েছি সেই বৃত্তান্তে আসা যাক। বহুদিন থেকেই সার্ত্রের উপন্যাস-নাটকগুলোর প্রতি দুর্বার আকর্ষণ বোধ করি আমি। বহুদিন থেকে শখ ছিল সার্ত্র এবং তাঁর অস্তিত্ববাদ নিয়ে একটা বেশ গুরুগম্ভীর গ্রন্থ রচনা করব। যথাসময়ে বইপত্র যোগাড় করে সে কাজ শুরুও করি, কিন্তু কিছুদিন পরই মনে হল, না, ব্যাপারটা ঠিক হচ্ছে না। অস্তিত্ববাদের গভীর থেকে গভীরতর দিকগুলোর সঙ্গে পরিচিত হতে হতে মনে হল অস্তিত্ববাদীদের মধ্যে যিনি সবচেয়ে মৌলিক, 'মহত্তম অস্তিত্ববাদী', মধ্য-ঊনবিংশ শতাব্দীর সেই বিষণ্ন ও উদ্বেগাকুল দিনেমার যুবক সোরেন কিয়ের্কেগার্ড যে দেড় শ বছর পরও আমাদের কাছে প্রায় অচেনা রয়ে যাচ্ছেন সেটা সমীচীন হচ্ছে না। খুব ঘনিষ্ঠভাবে না হলেও সার্ত্র এবং আর দু-একজন বিখ্যাত অস্তিত্ববাদীকে আমরা মোটামুটি চিনি এবং ভবিষ্যতে তাঁদের জানার আরও সুযোগ ঘটবে, কিন্তু তার আগে বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের সঙ্গে সোরেনের পরিচয়টা আরও নিবিড় হওয়া প্রয়োজন; আর তখনই এই বইয়ের কাজ শুরু করার সিদ্ধান্ত নিই।

কিন্তু আমাদের মতো দেশে সিদ্ধান্ত নিলেই কাজ শুরু করা যায় না। সচেতন পাঠক মাত্রই জানেন এখানে কিয়ের্কেগার্ডের এবং কিয়ের্কেগার্ড সম্পর্কিত কোনো বই খুঁজে বের করা কত কঠিন। যাই হোক যাঁদের সাহায্যে এই সমস্যা কিছুটা হলেও ওতরানো গেল, কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে তাঁদের ঋণ শোধ করার একটা ক্ষীণ চেষ্টা অন্তত করা যাক।

প্রথমেই আমার ভগ্নীপতি ড. হায়াৎ মামুদের কথা বলতে হবে। তাঁর সুবিশাল পাঠাগারের অসংখ্য বই নিয়ে আমি যথেচ্ছা টানাহেঁচড়া করেছি এবং তিনিও সর্বংসহার মতো সব সয়ে গিয়ে, বিন্দুমাত্র বিরক্তি প্রকাশ না করে উপরন্তু আমার পাণ্ডুলিপির ভাষাজনিত ত্রুটি সংশোধন করে দিয়েছেন। এ ছাড়াও ডাঃ মোহাম্মদ আলী (বাবু ভাই), জনাব সেলিম উল্লাহ,

জনাব রাশেদ মাহমুদ এবং আমার প্রিয় ছাত্র উত্তমের ব্যক্তিগত গ্রন্থসংগ্রহ ব্যবহার করে আমি সবিশেষ উপকৃত হয়েছি।

যাঁদের সঙ্গে আলোচনা করে আমি একই সঙ্গে অনুপ্রাণিত ও সমৃদ্ধ হয়েছি, তাঁরা হলেন—চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক, বিখ্যাত সমাজতত্ত্ববিদ ড. অনুপম সেন (তিনি তাঁর বহুমূল্যবান সময় নষ্ট করে পাণ্ডুলিপিটি আগাগোড়া পড়ে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়েছেন), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক *অস্তিত্ববাদ ও ব্যক্তিস্বাধীনতা*-র লেখক জনাব নীরুকুমার চাকমা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক, আমার পিতৃব্য, জনাব আহমদ কবির, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের চেয়ারম্যান জনাব মাসুদ মাহমুদ, একই বিভাগের অধ্যাপক জনাব আব্দুল ওয়াসিহ্ এবং জনাব মোহিত-উল-আলম, চট্টগ্রাম হাজী মোঃ মহসীন কলেজের দর্শন বিভাগের সহযোগী অধ্যাপিকা মিসেস রীতা দত্ত, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডঃ মাহবুবুল হক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ও গবেষক মোহাম্মদ নাসের এবং চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের প্রভাষক প্রাবন্ধিক-অনুবাদক জি. এইচ. হাবীব।

এখানে শ্রদ্ধেয় আলমগীর রহমানের নাম বিশেষভাবে উল্লেখ্য। তাঁর মতো দুঃসাহসী প্রকাশক আছেন বলেই আমার পক্ষে অস্তিত্ববাদ তুল্য সিরিয়াস বিষয় নিয়ে গ্রন্থ রচনায় প্রবৃত্ত হওয়া সম্ভব হয়েছে।

নির্ঘণ্ট প্রস্তুতে সাহায্য করেছেন আমার বহুদিনের দর্শন-সঙ্গী, দর্শনের ছাত্র জনাব আমির উদ্দিন এবং আমার ছাত্র পার্থ। আমার সব দায়-দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়ে নীরবে এই লেখার কাজে অনুপ্রেরণা দিয়ে গেছেন আমার স্ত্রী শায়লা সুলতানা।

২

এই বইয়ের অধ্যায়গুলোর নামকরণ যেভাবে করা হয়েছে তাতে একজন সাধারণ পাঠকের পক্ষে, যাঁর কিয়ের্কেগার্ড সম্পর্কিত পূর্বধারণা নেই, কোন অধ্যায়ে কী আছে তা আন্দাজ করা কঠিন। এ কারণে অধ্যায়গুলো সম্পর্কে দু-একটি কথা বলা প্রয়োজন।

'কোপেনহেগেনের বুড়ো খোকা' অধ্যায়ে কিয়ের্কেগার্ডদের অদ্ভুত পরিবার ও তৎকালীন ডেনমার্কের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা বর্ণনা করা হয়েছে। জীবনের শুরু থেকেই প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে বড় হয়েছেন কিয়ের্কেগার্ড, তবে চলমান স্রোতে কখনো গা ভাসিয়ে দেন নি, প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে করতেই নিজেকে সমৃদ্ধ করেছেন।

পরবর্তী 'আমার অস্তিত্ব বিপন্ন' অধ্যায়ে কিয়ের্কেগার্ড যে কীভাবে মরিয়া হয়ে হেগেল প্রমুখ বুদ্ধিবাদী দার্শনিকের বিরুদ্ধে লড়াই করেছিলেন, তারই একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। পাশ্চাত্য দর্শনে বহুদিন ধরে যে বিমূর্ত আধিবিদ্যক পদ্ধতি (metaphysical system) নির্মাণের প্রচেষ্টা চলে আসছিল কিয়ের্কেগার্ড তার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ান। তাঁর দর্শনালোচনার শুরুতেই এই অধ্যায়টি সংযুক্ত করা হয়েছে, তার কারণ বুদ্ধিবাদী দার্শনিকদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে গিয়েই তিনি তাঁর অস্তিত্ববাদী পথ খুঁজে পেয়েছিলেন।

তৃতীয় অধ্যায়ের 'আমিই সত্য' নামটি যিশুখ্রিষ্টের একটি উক্তি থেকে নেওয়া। এই অধ্যায়ের মূল বিষয় হচ্ছে সত্য সম্পর্কে কিয়ের্কেগার্ডের যুগান্তকারী ধারণা। যে 'বিষয়গত সত্য'কে (objective truth) এতদিন অভ্রান্ত বলে মনে করা হত কিয়ের্কেগার্ড তাকে অনিশ্চিত বলে উড়িয়ে দিলেন। তিনি বললেন, 'বিষয়গত সত্য' (objective truth)

গাণিতিক ও বৈজ্ঞানিকভাবে যত শুদ্ধ ও সঠিকই হোক না কেন, একজন ব্যক্তির জন্য তা সবসময়ই অনিশ্চিত। একজন ব্যক্তির কাছে সবচেয়ে বড় সত্য হচ্ছে তার নিজের সত্য, 'বিষয়ীগত সত্য' (subjective truth)।

'রেগিন ওলসেন' অধ্যায়ে যদিও কিয়ের্কেগার্ডের পিতা, বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্দাম-জীবন, লেখক হিসেবে ক্যারিয়ার গড়ে তোলার চেষ্টা ইত্যাদি বিষয় এসেছে, কিন্তু এই অংশের মূল উপজীব্য হচ্ছে তাঁর প্রেম, প্রেমিকা রেগিন ওলসেন। রেগিনের সঙ্গে গভীর প্রেম ও বাগদানের পর প্রায় হঠাৎ করে সম্পর্কটা ভেঙে দেন কিয়ের্কেগার্ড। এই ঘটনা খুব বড় প্রভাব ফেলে তাঁর লেখায় ও জীবনে।

যেসব পাঠক মানসিক শান্তির আশায় ধর্মকে আঁকড়ে ধরেছেন, তাঁদের 'অতলান্ত গহ্বর' অধ্যায়টি না পড়াই ভালো। পূর্ববর্তী দার্শনিকরা বহুদিন ধরে যে খ্রিষ্টধর্মীয় পথকে মসৃণ করার চেষ্টা করেছেন, কিয়ের্কেগার্ড এসে তা একেবারে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলেন; বললেন, খ্রিষ্টান হওয়ার সহজ কোনো রাস্তা নেই। খ্রিষ্টান কিংবা সত্যিকার অর্থে একজন ধার্মিক হতে হলে আপনাকে আপনার মাথা থেকে সব পূর্বধারণা নামিয়ে রেখে নিজের অস্তিত্বকে লক্ষ করতে হবে; ভাবতে হবে আপনি কোত্থেকে এসেছেন এবং এরপর কোথায়ই বা যাবেন। আপনি তখন প্যারাডক্সের মুখোমুখি হবেন এবং নিশ্চিতভাবেই ভয়ে শিউরে উঠবেন। কারণ আপনি দেখবেন নিদারুণ অনিশ্চয়তায় ভরা অনাদি অসীম খাঁ-খাঁ শূন্যতার কিনারায় নিরালম্ব ঝুলে আছেন আপনি। আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে লক্ষ করবেন, হতাশা গ্রাস করে নিচ্ছে আপনাকে। কিয়ের্কেগার্ড বলেন, এমত অবস্থায় আপনার পিছিয়ে এলে চলবে না। কারণ আপনি যদি সত্যিই ধার্মিক হতে চান, তা হলে মনে অটল বিশ্বাস নিয়ে সম্পূর্ণ অনিশ্চয়তার মধ্যে, সমুখে প্রলম্বিত অনড় প্যারাডক্সের মধ্য দিয়ে হেঁটে যেতে হবে, চোখ বন্ধ করে সোজা ঈশ্বরের উদ্দেশে অতলান্ত গহ্বরে ঝাঁপ দেওয়ার জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

বলাই বাহুল্য, 'খ্রিষ্টধর্ম' অধ্যায়ের মূল বিষয় হচ্ছে ধর্ম। কিয়ের্কেগার্ড তাঁর অস্তিত্ববাদী অবস্থানে দাঁড়িয়ে ধর্মকে সম্পূর্ণ নতুন ও আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখেছেন। তাঁর মতে, খ্রিষ্টধর্ম হচ্ছে সবচাইতে অযৌক্তিক ও অবাস্তব একটি ধর্ম; কিন্তু এতে কোনো ক্ষতিবৃদ্ধি হয় নি, কারণ একমাত্র অযৌক্তিক ও অবাস্তব বিষয়কেই প্রবল বিশ্বাসে আঁকড়ে ধরা সম্ভব। কিয়ের্কেগার্ডের কথা হচ্ছে, আগে প্রমাণ সংগ্রহ করে তারপর খ্রিষ্টান বা ধার্মিক হওয়া যায় না, কেউ যদি সত্যিকার অর্থে ধার্মিক হতে চায় তো তাকে ঝুঁকি নিতে হবে। এক্ষেত্রে তিনি সক্রেটিস ও যিশুখ্রিষ্টকে অনুসরণ করেছেন।

'জীবনের তিনটি স্তর' অধ্যায়ে মানবচরিত্রের তিনটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে কিয়ের্কেগার্ডের ধারণা বর্ণিত হলেও এখানে মূলত মানুষের ভোগী ও নৈতিক দিকগুলোর ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। 'খ্রিষ্টধর্ম' অধ্যায়ে 'ধর্মীয় স্তর'টি নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে বলে এখানে আর তার পুনরাবৃত্তি করা হয় নি। কিয়ের্কেগার্ডের এই বিষয়টি আলোচনাকালে আমি মূলত M. Holmes Hartshorne ও Louis Mackey-র সাহায্য নিয়েছি।

একজন তরুণ গল্পকার সৌরভ কুমার বড়ুয়া আমার পাণ্ডুলিপিটি 'জীবনের তিনটি স্তর' পর্যন্ত পড়ে বিস্ময়াভিভূত কণ্ঠে বলেছিলেন : কিয়ের্কেগার্ডের বিশ্বাস সম্পর্কিত কথাগুলো আর নতুন কি! ধর্মীয় পথে চলার সময় যুক্তির কাঁটায় পা বিঁধে গেলে আমাদের চারপাশের মোল্লা-ঠাকুর-পাদ্রি-ভান্তেরা তো হরহামেশাই বলেন : 'দু পাতা' ইংরেজি থেকে অর্জিত যুক্তি-বুদ্ধিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অখণ্ড মনোযোগে বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরতে না পারলে মুক্তি নেই। সৌরভের কথা শুনে মনে হল আরেকটি অধ্যায় লেখা উচিত। 'বিশ্বাস'-এর কথা বলতে

গিয়ে কিয়ের্কেগার্ড কীভাবে অস্তিত্ববাদের ভিত্তি নির্মাণ করেছেন তা আরও বিশদ করা প্রয়োজন। এভাবেই 'শেষ কথা' অধ্যায়ের সূত্রপাত। এই অধ্যায়ে কিয়ের্কেগার্ডের শেষ জীবন সম্পর্কিত বর্ণনাও অন্তর্ভুক্ত হয়েছে।

এই বইয়ের 'পরিশিষ্ট' অন্যান্য অধ্যায়গুলোর চেয়ে কোনো অংশেই কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। পরবর্তী কালের অস্তিত্ববাদকে প্রভাবিত করেছে কিয়ের্কেগার্ডের এমন যে সব বিষয় আমি মূল আলোচনার সঙ্গে মিশিয়ে উপস্থাপন করতে পারি নি, সেগুলোকে, পৃথকভাবে ও সংক্ষিপ্তাকারে এই অধ্যায়ে বর্ণনা করার চেষ্টা করেছি।

৩

সোরেন কিয়ের্কেগার্ডসহ অন্যদের নামের বাংলা বানান যেভাবে লিখেছি তা যথাযথ হয় নি। দিনেমার উচ্চারণের সঙ্গে বাংলায় লেখা এই নামগুলোর অনেক তফাৎ। আমি নিজে দিনেমার না জানলেও ঢাকাস্থ 'রয়্যাল ডেনিশ এমব্যাসি'-র সাহায্যে বিভিন্ন নামের উচ্চারণ রপ্ত করার চেষ্টা করেছি; জেনেছি বাংলায় যেভাবে 'সোরেন কিয়ের্কেকার্দ/কিয়ের্কেগার্ড' লেখা হয় তা শুদ্ধ নয়। আসল উচ্চারণ হবে 'সোয়েরেন কিয়ের্কেগ'। কিন্তু 'সোরেন কিয়ের্কেগার্দ/কিয়ের্কেগার্ড'-এ অভ্যস্ত আমাদের চোখ-কানে 'সোয়েরেন কিয়ের্কেগ' বিসদৃশ মনে হবে বলে আমি 'সোরেন কিয়ের্কেগার্ড'ই ব্যবহার করেছি। তবুও দু-একটি ক্ষেত্রে মূল দিনেমার উচ্চারণের সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করার লোভ সামলাতে পারি নি। সাধারণত বাংলায় যেভাবে 'রেজিন' লেখা হয় সেভাবে না লিখে 'রেগিন' লিখেছি; 'মাইকেল পেদারসন/পেডারসেন কিয়ের্কেগার্ড' না লিখে 'মিকেইল পিডারসেন কিয়ের্কেগ', 'জোহানেস'-এর জায়গায় 'ইওহানেস' এবং 'আনে সোরেনসড্যাটার লুণ্ড'-এর ক্ষেত্রে 'এইনে সাখেন্সড্যাটার লুন' ব্যবহার করেছি। তারপরও দিনেমার নামগুলোর বাংলা লিপ্যন্তরে অনেক অসঙ্গতি রয়ে গেল। আশা করি বিদগ্ধ পাঠকের ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে এসব ত্রুটিকে খুব অমার্জনীয় বোধ হবে না।

৫০০ জামাল খান লেন
আশকার দিঘির দক্ষিণ পাড়
চট্টগ্রাম

গোলাম ফারুক
৪ ফেব্রুয়ারি, ১৯৯৯

কোপেনহেগেনের বুড়ো খোকা

> সে বৃদ্ধ হতে পারে না, কারণ সে কখনো তরুণ ছিল না; এক অর্থে সে মৃত্যুবরণ করতে পারে না, কারণ সে কখনো বাঁচে নি; এক অর্থে সে বাঁচতে পারে না, কারণ ইতিমধ্যেই সে মৃত।[১]

Either/Or নামের বইটিতে চরম অসুখী একজন মানুষ সম্পর্কে এই কথাগুলো বলতে গিয়ে ডেনমার্ক নিবাসী সোরেন কিয়ের্কেগার্ড (১৮১৩–১৮৫৫) হয়তো তাঁর প্রথম জীবনের স্মৃতি দ্বারা তাড়িত হয়েছেন।

কিয়ের্কেগার্ডের জন্মের আগে অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে ডেনমার্কে দুটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। যদিও অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময় থেকেই বাণিজ্যিক কারণে ডেনমার্কের নিরবচ্ছিন্ন অর্থনৈতিক অগ্রগতি শুরু হয়, ঊনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে এসে তা ফুলে-ফেঁপে ওঠে। 'নেপোলিয়ন যুদ্ধে' (The Nepoleonic Wars) যখন ইওরোপের অন্যান্য সমুদ্রবন্দর একের পর এক বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল, দিনেমাররা তখন তাদের নিরপেক্ষ ভাবমূর্তির বদৌলতে কোপেনহেগেন বন্দর চালু রাখার সুযোগ পায়, এবং ১৮০১–১৮০৭ সাল পর্যন্ত চুটিয়ে ব্যবসা-বাণিজ্য করে।[২] দ্বিতীয় ঘটনাটি ঠিক এর বিপরীত। দিনেমারদের সৌভাগ্য দীর্ঘস্থায়ী হয় না। তৎকালীন ব্রিটিশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী ক্যানিং এক গুজবে কান দিয়ে ১৮০৭ সালের ৮ আগস্ট ডেনমার্ক আক্রমণ করে বসেন এবং বোমায় বিধ্বস্ত করে কোপেনহেগেন দখল করে নেন।[৩] এর পরের ইতিহাস খুব করুণ। ইংল্যাণ্ডের সঙ্গে যুদ্ধ, সামরিক পরাজয়, রাজনৈতিক কোন্দল, যুদ্ধজনিত অচলাবস্থা—সব মিলিয়ে ডেনমার্ক অর্থনৈতিকভাবে দেউলিয়া হয়ে যায়।*

কিয়ের্কেগার্ড যখন তাঁর শৈশব অতিক্রম করছেন, ডেনমার্কের তখন ভয়াবহ অবস্থা। অপরাধপ্রবণতা বেড়ে গেছে, মনোবৈকল্য কিংবা আত্মহত্যার হার অস্বাভাবিকরকম বেশি এবং একের পর এক ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া হয়ে যাচ্ছে। ১৮১৬–২০ সালের মধ্যে শুধু কোপেনহেগেনেই ২৫০টি প্রতিষ্ঠান দেউলিয়া হয়ে যায়।[৪]

তবে কিয়ের্কেগার্ডরা তেমন কোনো আর্থিক সঙ্কটে পড়েন নি। এর অনেক আগে

---

* এই সময়, ১৮১৪ সালের ১৪ জানুয়ারি অর্থাৎ কিয়ের্কেগার্ডের জন্মের এক বছর পর, দিনেমারদের কাছ থেকে নরওয়ে হাতছাড়া হয়ে যায়।[৫]

১৭৮৮ সালের দিকেই সোরেন কিয়ের্কেগার্ডের পিতা মিকেইল পিডারসেন কিয়ের্কেগ (১৭৫৭–১৮৩৮) অর্থনৈতিকভাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেছিলেন। পশ্চিম ইউটল্যাণ্ডের এক রাখাল বালক হিসেবে জীবন শুরু করে শুধুমাত্র পরিশ্রম ও মেধার জোরে তিনি কোপেনহেগেনের অন্যতম ধনবান ও প্রভাবশালী ব্যক্তিতে পরিণত হন। এই উত্থান যেমন নাটকীয়, তেমনি কর্মজীবন থেকে তাঁর হঠাৎ সরে আসাটাও অদ্ভুত। ১৭৮৮ সালে রাজকীয় লাইসেন্স পেয়ে তিনি যখন এক প্রভাবশালী ব্যবসায়ী হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হন, তখন তাঁর বয়স মাত্র ৩২ বছর। কিন্তু এরপর মাত্র ৮ বছর সক্রিয়ভাবে ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। তাঁর ৪০ বছর বয়সে প্রথম স্ত্রী দেহত্যাগ করেন এবং এই স্ত্রী–বিয়োগের দু মাসের মাথায় তিনি কর্মজীবন থেকে অবসর নেন। এরপর যদিও ব্যবসা জগতের সঙ্গে ক্ষীণ যোগাযোগ ছিল, বেশির ভাগ সময়ই তিনি ঘরে কাটাতেন। পাড়া–প্রতিবেশী, সামাজিক কর্মকাণ্ড— কোথাও নিজেকে জড়াতে চাইতেন না। নিঃসঙ্গতা এবং কী যেন এক অপরাধবোধ গ্রাস করে ফেলল তাঁকে। দিন দিন কেমন অদ্ভুত আর বিষণ্ন হয়ে উঠলেন। আবার ওদিকে অন্ধের মতো গোঁড়া খ্রিষ্টধর্মকে আঁকড়ে ধরলেন। সবচেয়ে বড় কথা এইসব পরিবর্তন তাঁর নিজের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল না, তিনি তা তাঁর পরিবারের ওপর চাপিয়ে দিলেন।[৬]

কিন্তু হঠাৎ করে এই পরিবর্তন কেন? কেন এই স্বেচ্ছানির্বাসন? কী সেই অপরাধবোধ যা তাঁকে তাড়িয়ে ফিরছিল? কেন এই বিষণ্নতা? কেনই–বা ব্যবসা–বাণিজ্য, সামাজিক মেলামেশা ইত্যাদি বাদ দিয়ে অন্ধের যষ্টির মতো ধর্মকে আঁকড়ে ধরা? এমন নয় যে স্ত্রী–বিয়োগে কাতর হয়ে পড়েছিলেন। কারণ নিঃসন্তান অবস্থায় প্রথম স্ত্রী মারা যাওয়ার পর বছর ঘুরতে–না–ঘুরতেই ১৭৯৭ সালের ২৬ এপ্রিল তিনি দ্বিতীয় বিয়ে করেন [এই দ্বিতীয় স্ত্রী অর্থাৎ এইনে সাখেন্সড্যাটার লুন (Ane Sørensdatter Lund) তাঁর দূরসম্পর্কের আত্মীয়া এবং বিয়ের আগে তাঁরই বাসায় পরিচারিকার কাজ করতেন]।[৭] স্বাভাবিক যুক্তিতে দ্বিতীয় বিয়ের পর তাঁর আগের চেয়েও আরো কর্মোদ্দীপ্ত, প্রাণচঞ্চল ও জাগতিক হওয়ার কথা, কারণ প্রথম স্ত্রী যেখানে নিঃসন্তান ছিলেন, দ্বিতীয় স্ত্রী, অর্থাৎ সোকির (সোরেন কিয়ের্কেগার্ড) মা, অল্পদিনের মধ্যেই তাঁকে বেশ কয়টি সন্তান উপহার দেন (সোকি ছিলেন এইনে–র সপ্তম ও শেষ সন্তান)।* তা হলে কি তিনি তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রীকে পছন্দ করতেন না? কিন্তু পছন্দ যদি না–ই করবেন, তা হলে কী কারণে একজন পরিচারিকাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিলেন?

অদ্ভুত রহস্যময় এই মানুষটিকে ঘিরে এরকম অনেক প্রশ্ন জেগে ওঠে, যার উত্তর খুঁজে পাওয়া সত্যিই কঠিন। পণ্ডিতরা মনে করেন সোকি পিতার এই হঠাৎ–পরিবর্তনের একটি কারণ অনুমান করেছিলেন এবং বেশ কিছু যুক্তিতে এই অনুমানকে তিনি সত্য বলে ভাবতেন।

সোকির ধারণা ছিল তাঁর মা, যখন একজন পরিচারিকা, তাঁর বাবা কর্তৃক ধর্ষিতা হয়েছিলেন বা তাঁর সঙ্গে অবৈধ যৌন সম্পর্ক স্থাপনে বাধ্য হয়েছিলেন। প্রথম স্ত্রী মারা যাওয়ার অল্পদিনের মধ্যেই মিকেইল দ্বিতীয় বিয়ে করেন এবং বিয়ের চার মাসের মধ্যে তাঁদের প্রথম সন্তানের জন্ম হয়। ফলে সোকির পক্ষে অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে মিকেইল, কোনো এক অসংলগ্ন মুহূর্তে, তাঁর গৃহে আশ্রিতা অসহায় রমণীটিকে ধর্ষণ করেন বা তাঁর সঙ্গে অবৈধ যৌন সংসর্গে লিপ্ত হন এবং পরে যখন এইনে–র গর্ভসঞ্চারের বিষয়টি

---

* কিয়ের্কেগার্ড ১৮১৩ সালে ১৫ মে জন্মগ্রহণ করেন।[৮] সেই সময় মা এইনে–র বয়স পঁয়তাল্লিশ এবং বাবা মিকেইলের বয়স ছাপ্পান্ন বছর।[৯]

স্পষ্ট হয়, তখন উপায়ান্তর না দেখে তাড়াহুড়ো করে বিয়ে করতে বাধ্য হন। সোকির মতে, এই ঘটনাই হঠাৎ পরিবর্তন নিয়ে আসে মিকেইলের জীবনে। এ কারণেই তাঁর কট্টর ধার্মিকতা, এ কারণেই নিঃসঙ্গ, অসামাজিক, বিষণ্ন, অদ্ভুত এক মানুষে পরিণত হয়েছিলেন তিনি।*

প্রকাশ্যে বিয়ে করার আগে মিকেইল কি এইনে–কে গোপনে বিয়ে করেছিলেন? এর কোনো প্রমাণ নেই। তবে সঞ্জীব ঘোষ সম্পাদিত *অস্তিবাদ দর্শনে ও সাহিত্যে* থেকে বাবা মিকেইল প্রসঙ্গে সোকির একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করা যেতে পারে।

> আমাদের কথাবার্তা আলাপ–আলোচনার সময় একদিন অসতর্ক মুহূর্তে প্রকাশ হয়ে পড়ে যে, তিনি জীবনে একবারই একটি গুরুতর অপরাধ (ধর্মীয়/ নৈতিক) করেছেন, আর তা হল একটি যৌন অপরাধ। গোপনে একটি মেয়েকে বিয়ে করে তার সঙ্গে যৌন সংসর্গে লিপ্ত হয়েছেন। এটি একটি ব্যভিচার ভেবে ঈশ্বরের কাছে অপরাধী বলে মনে করতেন...।[১০]

সোকি তাঁর ডায়েরিতে লিখেছেন, যখন বিষয়টি জানলেন, "তখন যেন বিরাট ভূমিকম্প হল।" তখন তাঁর বাবা, তাঁর পরিবার এবং নিজেকে আর আগের চোখে দেখতে পারলেন না। মনে হল দীর্ঘজীবন তাঁর পিতার জন্য কোনো স্বর্গীয় আশীর্বাদ নয় বরং অভিশাপ। তিনি লিখেছেন, "আমার পিতার ভেতর আমি এমন এক হতভাগ্য মানুষকে দেখতে পেলাম, যাঁকে আমাদের সবার মৃত্যুর পরও বেঁচে থাকতে হবে", "তাঁর সব আশার কবরের ওপর" আমি "মৃত্যুশীতল ক্রুশ" দেখতে পেলাম। এ সময় নিজের পরিবার সম্পর্কে তিনি যে কতটা শঙ্কিত হয়ে পড়েছিলেন তা তাঁর 'দিনলিপি'–র স্মৃতিচারণমূলক লেখা পড়লেই বোঝা যায়।

> আমার মনে হত পুরো পরিবারকেই অপরাধের ভার বহন করতে হবে। নিশ্চিতভাবেই অবিলম্বে এর ওপর স্বর্গীয় শাস্তি নেমে আসবে, এটা অবশ্যই লুপ্ত হবে, সর্বশক্তিমান ঈশ্বর একে নিশ্চিহ্ন করে দেবেন, একটি ব্যর্থ নিরীক্ষা হিসেবে এটা উবে যাবে এবং কেবল কখনোসখনো আমি এই চিন্তা করে একটু স্বস্তি পেতাম যে, আমার বাবা ধর্মীয় প্রশান্তি দ্বারা আমাদের কষ্ট অপনোদন করার গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন, আমাদেরকে তৈরি করার চেষ্টা করেছেন, যাতে এই পৃথিবীতে আমরা যদি সব হারিয়েও ফেলি,...এই পৃথিবী থেকে যদি আমাদের সব স্মৃতি মুছে যায় বা আমাদের নাম নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়, পরবর্তীকালে যেন আরো ভালো কোনো জগতের দুয়ার আমাদের সামনে উন্মোচিত হয়।[১১]

মিকেইল পিডারসেন কিয়ের্কেগর হঠাৎ–পরিবর্তনের পেছনে যে কারণ সোকি অনুমান করেছিলেন তা কতটা নির্ভুল, সে বিচার করা দুরূহ, তবে তাঁর বিমর্ষতা, বিষণ্নতা, অসামাজিক মনোভাব, এবং বিশেষ করে তাঁর ধর্মীয় গোঁড়ামি যে তিনি তাঁর পরিবারের ওপর আরোপ করতে পেরেছিলেন, তাতে কোনো সন্দেহ নেই। বলাই বাহুল্য, এর ফলাফল ভালো হয় নি। পিতার আদেশে কঠোর ধর্মীয় অনুশাসন মানতে গিয়ে তাঁর কী অবস্থা হয়েছিল তা তাঁর লেখা পড়লেই বোঝা যায় :

---

* এই বিষয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে ভিন্ন মত পরিলক্ষিত হয়। অন্য অনেকের মতো W. H. Auden তাঁর *The Living Thoughts of Kierkegaard* গ্রন্থে লিখেছেন যে কৈশোরে ঈশ্বরকে অভিসম্পাত দিয়েছিলেন বলেই মধ্যবয়সে এসে মিকেইলের এই পরিণতি হয়।[১২]

Frederick Copleston লিখেছেন, কিয়ের্কেগার্ডের বাবা যিনি ইউটল্যান্ডের তৃণপ্রান্তরে মেষ চরাতেন, একদিন একাকিত্ব, ক্ষুধা ও ঠাণ্ডায় অতিষ্ঠ হয়ে ঈশ্বরকে অভিশাপ দিয়েছিলেন এবং এই কৃতকর্মের জন্য সারা জীবন অপরাধবোধে ভুগেছেন।

> শৈশবে অত্যন্ত কঠোরভাবে কট্টর ধর্মীয় নিয়মনীতির মধ্য দিয়ে বড় হয়েছি আমি...। একটি শিশু বাতিকগ্রস্তের মতো একজন বিষণ্ন বুড়ো মানুষ হয়ে চলাফেরা করত। ওহ! কী ভয়ানক! এমতাবস্থায় খ্রিস্টধর্মকে যে আমার অমানবিক ও নৃশংস বলে বোধ হবে, তাতে আর আশ্চর্য কি।[১৩]

সোকি ও তাঁর ভাইবোনেরা একটা অস্বাভাবিক গুমট আবহাওয়ায় বড় হয়েছিলেন। তাঁরা প্রায় কেউ-ই বন্ধুবান্ধব বা পাড়া-প্রতিবেশীদের বাসায় যেতেন না, ফলে বন্ধুরাও ওঁদের বাড়িতে আসত না। ওঁদের কোনো বন্ধুই ছিল না বলতে গেলে। এভাবে শৈশবে সোকির মনোজগতে যে নিঃসঙ্গতা ও বিষণ্নতার বীজ উপ্ত হয়েছিল কালক্রমে তা-ই মহীরুহের আকার ধারণ করে। এক জায়গায় তিনি নিজেই নিঃসঙ্গ এক বৃক্ষের সঙ্গে নিজেকে তুলনা করেছেন :

> আত্মশ্লাঘায় পূর্ণ, বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ এক ফার গাছের মতো সোজা ঊর্ধ্বমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে আছি আমি, কোথাও আমার কোনো ছায়া পড়ে না, কেবল কিছু কাঠঠোকরা পাখি এসে ডালপালাগুলোতে বাসা বাঁধে।[১৪]

হয়তো এ কারণেই শৈশব-কৈশোরের অস্বাভাবিক জীবন যাপনকে মেনে নিতে পারেন নি সোকি। এ ব্যাপারে তিনি ভেতরে ভেতরে বরাবরই যে ক্ষুব্ধ ছিলেন বিভিন্ন লেখায় তার প্রমাণ মেলে। ১৮৪৩ সালে (তারিখ উল্লেখ নেই) জার্নালে লিখেছেন :

> অন্য স্বাস্থ্যোজ্জ্বল বাচ্চাদের মতো ছোটাছুটি করি নি কেন, কেন আনন্দ দিয়ে মোড়ানো হয় নি আমাকে, এত আগে কেন দীর্ঘশ্বাসের রাজ্যে প্রবেশ করতে হল, কেন এমন এক উদ্বেগকে মাথায় নিয়ে জন্মগ্রহণ করলাম, যে-উদ্বেগ সর্বদাই আমার মনোযোগ কেড়ে নেয়, কেন মাতৃগর্ভে নয় মাসেই বৃদ্ধ হয়ে গেলাম আমি, এবং একটি শিশু হয়ে জন্ম না নিয়ে একজন বৃদ্ধ মানুষ হিসেবে ভূমিষ্ঠ হলাম?[১৫]

জার্নালের আরেক জায়গায় লিখেছেন :

> বুড়ো হয়েই জন্মেছিলাম আমি। আমি ছিলাম নাজুক, রোগা ও দুর্বল, অন্য ছেলেদের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলার কিংবা অন্যদের মতো একজন স্বাভাবিক মানুষ হিসেবে বেঁচে থাকার প্রায় কোনো যোগ্যতাই আমার ছিল না; অসুস্থমনা, বিষণ্ন, বহুবিধার্থে নিতান্ত হতভাগা।[১৬]

স্বাভাবিকভাবেই এ ধরনের পারিবারিক প্রভাব সোরেনের একার ওপর পড়ে নি, সব ভাইবোনই কম-বেশি আক্রান্ত হয়েছিল। সোরেনের ভাই পিটার ক্রিশ্চান ছিলেন বিশপ। কিন্তু তিনি এক সময় এত বিষাদগ্রস্ত হয়ে পড়েন যে তাঁর চাকরি চলে যায়। এই বিষাদগ্রস্ততা এবং কখনো কখনো বিকারগ্রস্ততার হাত থেকে সোকিদের পরের প্রজন্মও রেহাই পায় নি। পিটার ক্রিশ্চানের এক ছেলেকে উন্মাদ আশ্রমে আটকে রাখতে হয়। তবে উন্মাদ হলেও তার সূক্ষ্ম রসবোধ ছিল। তার একটা উক্তি তো মোটামুটি বিখ্যাত : "আমার চাচা [সোকি] ছিলেন Either/Or [এই নামে সোকির একটি বই আছে], আমার বাবা হচ্ছেন Both-And [এই নামে হেগেলের একটি বই আছে] এবং আমি হলাম Neither/Nor"[১৭] সোরেনের এক ভাইপো তো উন্মাদ হয়ে একসময় আত্মহত্যা করে বসে।

পরিবারের সদস্যদের ভেতর এই অস্বাভাবিকতা কিংবা অসুস্থতা সঞ্চারিত বা সংক্রামিত করার জন্য মিকেইল পিডারসেন কিয়ের্কেগকে নিঃসন্দেহে দায়ী করা যায়। কিন্তু পৃথিবীর অন্যতম প্রধান এক দার্শনিককে গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তাঁর অবদান নেহাত কম নয়।

মিকেইল তাঁর ছেলেমেয়েদের ওপর ঘরে আবদ্ধ হয়ে থাকার যে সমন জারি করেছিলেন, তা একদিক দিয়ে সোকির জন্য শাপে বর হয়ে যায়। ছোটবেলা থেকে নিঃসঙ্গ অবস্থায় থাকতে থাকতে গভীর চিন্তায় ডুবে থাকার অভ্যাস তৈরি হয়ে যায় তাঁর। পৈতৃক সূত্রে আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্য লাভ করেছিলেন তো বটেই, তবে তার চেয়েও অনেক গুরুত্বপূর্ণ যা পেয়েছিলেন তা হচ্ছে কল্পনা করার ক্ষমতা। মিকেইলের প্রখর কল্পনাশক্তি ছিল এবং তার চেয়েও বড় কথা তিনি জানতেন অন্যদের মধ্যে তা কীভাবে সঞ্চারিত করতে হয়। এ প্রসঙ্গে ইওহানেস ক্লাইমেকাস ছদ্মনামে সোকি যে-স্মৃতিচারণ করেছেন তার অংশবিশেষেই বিষয়টা স্পষ্ট হবে :

> তার বাড়িতে তেমন কোনো বৈচিত্র্য ছিল না এবং যেহেতু কদাচিৎ বাইরে বেরোত সে, ফলে খুব অল্প বয়স থেকেই নিজে নিজে ভাবতে এবং একা একা নিজের সঙ্গে থাকতে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিল। তার বাবাকে মনে হত খুব কঠোর, আপাতদৃষ্টিতে কর্কশ ও কাঠখোট্টা, কিন্তু তার খসখসে কোটের আড়ালে লুকিয়ে থাকত কল্পনার দীপ্তি এবং তা এতই অসাধারণ ছিল যে বয়সের ভারও তাকে ম্লান করতে পারে নি। মাঝেমধ্যে ইওহানেস যখন বাইরে বেরোতে চাইত, তাকে সাধারণত যেতে দেওয়া হত না। কিন্তু কখনোসখনো, হয়তো এরই ক্ষতিপূরণ হিসেবে, বাবা নিজেই ঘরের ভেতর হাত ধরাধরি করে হাঁটার প্রস্তাব দিতেন। প্রথম দৃষ্টিতে মনে হতে পারে এটা কি বাইরে হেঁটে বেড়ানোর একটা বিকল্প হল! কিন্তু তবুও ওই খসখসে কোটের ভেতর যা লুকিয়ে থাকত, তাতেই সবকিছু কেমন পাল্টে যেত। প্রস্তাব গৃহীত হত, তারপর ইওহানেসের ওপরই তাদের গন্তব্য ঠিক করার ভার পড়ত। তারা কোনোদিন যেত কাছাকাছি কোনো গ্রীষ্ম-প্রাসাদে, অথবা দূরের কোনো সমুদ্রসৈকতে, কোনোদিন-বা শুধু রাজপথ ধরেই হেঁটে বেড়াত। ইওহানেস যেখানে চাইত, সেখানেই যাওয়া হত, বাবার কোনো অসুবিধে ছিল না। তিনি সব জায়গাতেই যেতে পারতেন। ঘরের মধ্যে হাঁটতে হাঁটতে তিনি সবকিছুর অনুপুঙ্খ বর্ণনা দিতেন। তারা পথিকদের সম্ভাষণ জানাত, মাঝে মাঝে গাড়ির ঘরঘর শব্দে বাবার কথা অস্পষ্ট হয়ে যেত; যে মেয়েটি কেক বিক্রি করে, তার মজার মজার খাবারগুলো অন্য যে কোনো সময়ের তুলনায় অনেক বেশি লোভনীয় মনে হত। তাঁর বর্ণনা থেকে সূক্ষ্মতম বিষয়গুলোও বাদ পড়ত না। তিনি এত সঠিকভাবে সবকিছুর এত স্পষ্ট, বাস্তবানুগ ও প্রাঞ্জল বর্ণনা দিতেন যে আধঘণ্টা হাঁটার পরই সে আচ্ছন্ন ও ক্লান্ত হয়ে পড়ত এবং মনে হত সারা দিন সে বাড়ির বাইরে ছিল। পিতার কাছ থেকে ইওহানেস শিগগিরই এই ঐন্দ্রজালিক ক্ষমতা রপ্ত করে নিল। তারপর থেকে এতদিন যা ছিল মহাকাব্যের মতো তা এখন খেলায় পরিণত হল। তারা হাঁটতে হাঁটতে কথা বলত। হাঁটার রাস্তাটা যদি পরিচিত হত, তা হলে কিছু বর্ণনা করার সময় কেউ কিছু বাদ দিচ্ছে কি না অন্যজন তা খেয়াল রাখত। যদি পথটা অপরিচিত হত, ইওহানেস বাবার উদ্ভাবনী ক্ষমতার সঙ্গে নিজেরটা যুক্ত করত...। সে বাবাকে প্রভু [যিশু] এবং নিজেকে তাঁর প্রিয় সহচর বলে কল্পনা করে নিত। প্রিয় সহচর, কারণ খুশিমতো নিজের শিশুসুলভ সরস কথাগুলো উত্থাপন করার সুযোগ ছিল তার, কারণ তাকে কখনো নিরুৎসাহিত করা হয় নি...। সবকিছুই করা হত ইওহানেসকে খুশি করার জন্য।[১৮]

এই পিতা-পুত্র সম্পর্কের এরকমই আরেকটি দিক নিয়ে সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়ের *অস্তিবাদ দর্শনে ও সাহিত্যে* বইতে কিছু চমৎকার কথা আছে :

> পিতার প্রেরণায় যথার্থ অর্থেই কিয়ের্কেগার্ড শিক্ষিত হয়ে উঠছিলেন। তাঁদের বাড়িটি ছিল কোপেনহেগেনের বুদ্ধিজীবীদের আড্ডাস্থল। বিশপ মিন্‌স্টার এবং মার্টেনসন ছিলেন নিত্যদিনের অতিথি। পিতা-পুত্র তাদের চারপাশে গড়ে তুলেছিলেন এক সাংস্কৃতিক আবহাওয়া। কিয়ের্কেগার্ডের পিতা জীবনের প্রথম দিকে ছিলেন খুবই গরিব। প্রচলিত অর্থে তিনি শিক্ষিত ছিলেন না। তবে কল্পনাশক্তি, তীক্ষ্ণ মেধা এবং অসাধারণ উপস্থিতবুদ্ধির অধিকারী হওয়ার জন্য তিনি ছিলেন বুদ্ধিজীবীদের প্রীতিভাজন। বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে পিতা-পুত্র একত্রে আলোচনায় অংশগ্রহণ করতেন, তর্ক করতেন, নানা সমস্যা নিয়ে ভাবতেন। মাঝে মাঝে পিতা-পুত্র একে অন্যের সঙ্গে তর্কে মেতে উঠতেন এমনভাবে যে, মনে হত পিতা-পুত্র নয়, দুই বুদ্ধিজীবী যেন গভীর কোনো সঙ্কট নিয়ে আলোচনারত।[১৯]

এখানে আরেকটা বিষয় উল্লেখ করা দরকার। ছোটবেলায় আরেকটি বিশেষ গুণ অর্জন করেছিলেন সোকি। যখন স্কুলে ভর্তি হন, তখন তাঁর ছ'বছর বয়স। স্কুলে ঢোকার পর থেকেই নানা কারণে তিনি সহপাঠীদের আক্রমণের শিকার হন। তাঁর সাজসজ্জা ছিল গির্জার গায়ক-বালকদের মতো। এই অদ্ভুত পোশাকের জন্য তাঁকে প্রায়শই সহপাঠীদের টিটকারি শুনতে হত। সরু মুখমণ্ডলের ওপর বসানো মুখটাকে অনেক সময় শূকরের মুখের মতো দেখাত, আর ওঁর চিবুক দেখে মনে হত যেন ঝুলে আছে ওটা। এসব গোদের ওপর বিষফোড়ার মতো যুক্ত হয়েছিল তাঁর শারীরিক অসুস্থতা। ছোটবেলায় গাছ থেকে পড়ে গিয়ে মেরুদণ্ডে ব্যথা পেয়েছিলেন। এ কারণে একটু কুঁজো হয়ে হাঁটতেন। ফলে ক্লাসের ছেলেদের কাছে এক মজার বিষয়বস্তু ছিলেন তিনি। তারা নানাভাবে তাঁকে উত্যক্ত করে মারত। তাঁকে 'Søren Sock' বা 'গির্জার পিচ্চি গায়ক' বলে ক্ষেপাত। ভালো জামাকাপড় পরে যে ওদের মুখ বন্ধ করবেন, কট্টর বাবার জন্য সে উপায় ছিল না। দুর্বলতার জন্য শারীরিকভাবেও কারো মোকাবিলা করতে পারতেন না।[*২০]

বাইরের নিষ্ঠুর জগতের মুখোমুখি হওয়ার জন্য নিঃসঙ্গ ও বিষণ্ন বালকটির হাতে প্রায় কিছুই ছিল না, সম্বল কেবল উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বোধশক্তি ও কল্পনা; তাই উপায়ান্তর না দেখে এদেরকেই শানিয়ে নিলেন। ধীরে ধীরে বোধ আরো প্রখর হল, ব্যাপ্ত হল কল্পনা। জীবন-যুদ্ধে টিকে থাকার জন্য তিনি গড়েপিটে এগুলোকেই হাতিয়ার বানিয়ে নিলেন। শুধু ছোটবেলায় নয়, সারা জীবন এই হাতিয়ার ব্যবহার করেছেন সোকি। স্কুলের সেই ছেলেরা কিংবা বিদগ্ধ সমালোচক, মার্টেনসন কিংবা হেগেল—প্রতিদ্বন্দ্বী যে-ই হোক, সোকির হাতে বারংবার ঝলসে উঠেছে এরা।

---

* সোকির বিখ্যাত উত্তরসূরি জঁ-পল সার্ত্রের জীবনেও প্রায় একই অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। ছোটবেলায় তিনিও নিঃসঙ্গ ছিলেন। শারীরিক দুর্বলতা ও অন্য অনেক কারণে সমবয়সী ছেলেদের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে মিশতে পারতেন না। সার্ত্র তাঁর আত্মজীবনীমূলক রচনা 'শব্দ'-তে লিখেছেন, "ছেলেমেয়েরা খেলা করত লুক্সাঁবুর্গ বাগানে, আমি তাদের কাছাকাছি ঘেঁষতাম, আমায় না দেখেই তারা হয়তো আমার গায়ে ধাক্কা দিল। ভিখারির চোখ নিয়ে আমি তাকাতাম তাদের দিকে। কী শক্ত তারা, কী ত্বরিত গতি তাদের! কী সুন্দর দেখতে! এই অস্থিমাংসের নায়কদের সামনে পড়ে লোপ পেয়ে যেত আমার আশ্চর্য বুদ্ধিশক্তি।"[২১]

পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আমরা যখন সোকির চিন্তারাজ্যে প্রবেশ করব, আমাদের মনে রাখতে হবে এই শৈশব-কৈশোর, তাঁর নিঃসঙ্গতা ও বিষণ্ণতা। আমাদের মনে রাখতে হবে তাঁর পরিবার ও পিতার কথা। জীবনের এইসব অনুভূতি, অনুভব ও অভিজ্ঞতাই তিল তিল করে তাঁর দর্শন নির্মাণ করেছে। ফলে সোকির দর্শন আলোচনাকালে বারবার তাঁর ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ আসবেই। সব দর্শনালোচনাতেই হয়তো তা আসে। কিন্তু সোকির ক্ষেত্রে বিষয়টি বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে এই কারণে যে, তিনি জ্ঞান, বুদ্ধি বা প্রজ্ঞা নয়, বরং জীবনকে আশ্রয় করেছিলেন, যেন তাঁর প্রিয় দার্শনিক 'মহান' সক্রেটিসের মতো নিজের জীবনকে নিংড়েই সৃষ্টি করেছেন তাঁর দর্শন।*

আমরা দেখেছি শৈশব-কৈশোরের কী রকম প্রতিকূল পরিস্থিতিতে তিনি মানুষ হয়েছেন এবং আমরা এও দেখেছি সেই প্রতিকূল পরিস্থিতির সঙ্গে লড়াই করতে করতেই তিনি কীভাবে সমৃদ্ধ হয়েছেন।

শুধু পরিবার কিংবা স্কুল নয় আমরা সোকিকে আরো বড় প্রেক্ষাপটে দেখেছি। সেখানকার চিত্রও খুব অনুকূল নয়। অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে দিনেমাররা তখন চরম হতাশা ও সঙ্কটের মধ্য দিয়ে যাচ্ছিল। তবে একটু সামঞ্জস্যহীন মনে হলেও, ডেনমার্কের বিশেষ করে কোপেনহেগেনের সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলে তখন অগ্রগতি সূচিত হয়েছে। ১৮১৩-১৮৩৫ কালপর্বে ডেনমার্কে প্রচুর প্রতিভাবান বুদ্ধিজীবী, ধর্মতত্ত্ববিদ ও শিল্পীর আলোড়ন পরিলক্ষিত হয়।[২২] এই সময়কার বিখ্যাত দিনেমার সাহিত্যিক হান্স ক্রিশ্চান আনেরসেন (১৮০৫-১৮৭৫) ইওরোপীয় সাহিত্যরসিকদের মনোযোগের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিলেন।[২৩] যে যুগকে ডেনমার্কের স্বর্ণযুগ বলা হয়, এই সময়েই তার সূচনা।

তবে এই সময়কার দিনেমার বুদ্ধিবৃত্তিক বা সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের প্রাণকেন্দ্র ছিল প্রতিবেশী দেশ জার্মানি। ডেনমার্কে যাঁরা বুদ্ধিজীবী বলে পরিচিত ছিলেন, তাঁরা প্রায়শই কিছুদিনের জন্য বার্লিন থেকে ঘুরে আসতেন, তারপর সেখানকার সদ্যোজাত চিন্তাধারাগুলোর সঙ্গে পরিচিত হয়ে কোপেনহেগেনে এসে ঝড় তুলতেন। ফলে জার্মানিতে যা ঘটত তা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই দিনেমারদের জানা হয়ে যেত। প্রায় সব শিক্ষিত লোকেরাই জার্মান ভাষা লিখতে, পড়তে ও বলতে পারতেন। এহেন অবস্থায় মহাপরাক্রমশালী সমসাময়িক জার্মান দার্শনিক হেগেল যে অনায়াসে ডেনমার্কে তাঁর ব্যাপক প্রভাব বিস্তার করবেন, তা খুবই স্বাভাবিক। কিন্তু সোকি হেগেলের এই প্রভাবকে মেনে নিতে পারেন নি। প্রবল দেশপ্রেমিক ছিলেন বলে কি একে একধরনের বুদ্ধিবৃত্তিক বা সাংস্কৃতিক আগ্রাসন মনে হয়েছিল? নাকি বিশুদ্ধ দর্শনগত কারণেই তিনি হেগেলের বিরোধিতা করেছিলেন? কিংবা হেগেলের দর্শনে নিতান্ত ব্যক্তিগত সমস্যার সমাধান খুঁজে না পেয়ে হেগেলের প্রতি বিরাগ জন্মেছিল তাঁর? এইসব প্রশ্ন নিয়েই এবার আমরা পরবর্তী অধ্যায়ের মুখোমুখি হব।

---

* তবে এটাও মনে রাখা দরকার কিয়ের্কেগার্ড তাঁর দর্শনকে শুধু ব্যক্তিগত পর্যায়ে সীমাবদ্ধ রাখেন নি। এ প্রসঙ্গে Frederick Copleston লিখেছেন, "Kierkegaard has to universalize. Without universalization there would be only autobiography".

তথ্যসূত্র :

১. Kierkegaard, Søren, *Either/Or vol.* 1 trans. David F. and Lillian Marvin Swenson, 1971, Princeton, Princeton University Press, p. 185
উদ্ধৃত, Hartshorne, M. Holmes, 1990, *Kierkegaard Godly Deceiver,* New York, Columbia University Press, p. 1

২. *The New Encyclopaedia Britanica,* 15th edition, *vol.* 17, p. 238

৩. Ibid., p. 238

৪. Bhattacharya, Asoke, 1991, *Existentialism Kierkegaard Heidegger and Sartre,* Calcutta, p.4

৫. *The New Encyclopaedia Britanica,* p. 238

৬. *Existentialism Kierkegaard Heidegger and Sartre,* p. 21

৭. Ibid., p. 21

৮. Ibid., p.21

৯. Hartshorne, M. Holmes, 1990, *Kierkegaard Godly Deceiver,* New York, Columbia University Press, p.1

১০. সঞ্জীব ঘোষ (সম্পা.), ১৯৮৬, *অস্তিবাদ দর্শনে ও সাহিত্যে,* কলকাতা, পৃ: ৯

১১. *Existentialism Kierkegaard Heidegger and Sartre,* p. 33

১২. Auden, W. H. 1971 (presented), 1971, *The Living Thoughts of Kierkegaard,* Bloomington and London, Indiana University Press, p.3

১৩. *Existentialism Kierkegaard Heidegger and Sartre,* p.26

১৪. Blackham, H. J. 1952 (rpt. 1994), *Six Existentialist Thinkers,* London and New York, Routledge, p. 1

১৫. *Kierkegaard Godly Deceiver,* p. 95

১৬. *Existentialism Kierkegaard Heidegger and Sartre,* p.25

১৭. Ibid., p.26

১৮. Ibid,, p.24

১৯. *অস্তিবাদ দর্শনে ও সাহিত্যে,* পৃ: ৮

২০. *Existentialism Kierkegaard Heidegger and Sartre,* p. 23

২১. সার্ত্র, জঁ-পল, ১৯৮৮, *শব্দ* (অনু-লোকনাথ ভট্টাচার্য), কলিকাতা, সাহিত্য অকাদেমি, পৃ: ১০০

২২. *Existentialism Kierkegaard Heidegger and Sartre,* p.14

২৩. হায়াৎ মামুদ, ১৩৯৮ (বাংলা), *মৎস্যকন্যা,* ঢাকা, গণ প্রকাশনী, পৃ: ৯৫

২৪. Copleston, Frederick, 1971, *A History of Philosophy, Vol. VII,* London, Search Press, p. 337

আমার অস্তিত্ব বিপন্ন

একজন যুবক, যে সন্দেহপ্রবণ এবং অস্তিত্বশীল, একজন চিন্তা-বীরের প্রতি প্রেমময় ও অপরিসীম আস্থায় দীপ্ত হৃদয় নিয়ে হেগেলের ইতিবাচক দর্শনে তার অস্তিত্বের সত্যতা খুঁজতে গেল : তার আশা সে হেগেল সম্পর্কে ভীষণ রকমের সরস বুদ্ধিদীপ্ত ছোট্ট একটি কবিতা লিখবে... সে নিজেকে নিঃশর্তে সমর্পণ করল, কোনো নারী তাঁর পরম আরাধ্য পুরুষের কাছে নিজেকে যেভাবে সমর্পণ করে সেভাবে : কিন্তু এক্ষেত্রে সে যদি তার নিজের সমস্যার কথা না ভোলে, সমস্যাটি সমাধানকল্পে সে যদি অটল থাকে তা হলে শেষ পর্যন্ত তার ভেতর থেকে হেগেল সম্পর্কে বিদ্রূপাত্মক কবিতাই বেরিয়ে আসবে, আর কিছু নয়। এই যুবকটি অস্তিত্বশীল এবং সন্দেহপ্রবণ। উচ্ছন্ন-জীবন নিয়ে সন্দেহের মধ্যে ঘুরপাক খেতে খেতে সত্যের সন্ধানে সে এখানে এসেছে—সত্যের মধ্যে সে তার অস্তিত্ব নিয়ে বাস করতে চায়। সে নিজে একজন নেতিবাচক মানুষ এবং হেগেলের দর্শন ইতিবাচক। ফলে স্বাভাবিকভাবেই সে হেগেলের আশ্রয় প্রত্যাশা করছে। কিন্তু একজন অস্তিত্বশীল ব্যক্তির কাছে, যদি সে বাস্তবে অস্তিত্বশীল কোনো সত্য পেতে চায়, বিশুদ্ধ চিন্তার দর্শনকে কিম্ভূতকিমাকার এক ধারণা বলে প্রতীয়মান হবে। বিশুদ্ধ চিন্তাকে অনুসরণ করে অস্তিত্বশীল থাকার অর্থ অনেকটা ইওরোপের ছোট্ট একটা ম্যাপ নিয়ে ডেনমার্কে ঘুরে বেড়ানো, যে ম্যাপে ডেনমার্ক একটা বিন্দু ছাড়া আর কিছু নয়—না, একটু ভুল হল, বিষয়টি আসলে তার চেয়েও অসম্ভব।[১]

শৈশবে আচরিত কট্টর খ্রিষ্টীয় ধর্মাচরণে নিজের অস্তিত্বকে খুঁজে না পেয়ে সোকি হেগেলের দ্বারস্থ হয়েছিলেন। কিন্তু এখানেও 'জাতি-রাষ্ট্রের'* (nation-state) বিশাল জৈবশরীরে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ব্যক্তি-মানুষের সারধর্মের ভেতর কোথাও নিজেকে পুরোপুরি দেখতে পেলেন না। তিনি উপলব্ধি করলেন বাবার জোর করে গিলিয়ে দেওয়া খ্রিষ্টধর্মের মতো হেগেলীয় দর্শনেও তাঁর নিজ-অস্তিত্বের কোনো ঠাঁই নেই। যে দর্শন তাঁর নিজের ব্যক্তি-অস্তিত্বকেই ব্যাখ্যা করতে পারে না, যে দর্শনে তাঁর নিজের অস্তিত্বশীল সত্তা

---

* হেগেলের মতে, 'জাতি-রাষ্ট্র' হচ্ছে আমাদের সংস্কৃতি, প্রাতিষ্ঠানিক জীবন ও নৈতিকতার একমাত্র উৎস।

মূল্যহীন, সে দর্শন যত 'মহান'ই হোক তাঁর কাছে অকিঞ্চিৎকর বলে বোধ হল। শুধু তৎকালীন দিনেমার বিদ্বৎসমাজের নয়, গোটা ইওরোপীয় বুদ্ধিজীবীমহলের মধ্যমণি গেওর্গ হ্বিল্‌হেল্‌ম্‌ ফ্রিডরিশ্‌ হেগেল তাঁর তীব্র ব্যঙ্গ ও বক্রোক্তির শিকার হলেন।*

হেগেলের বিরুদ্ধে কিয়ের্কেগার্ডের আপাতসাধারণ যে অভিযোগ তা হচ্ছে, হেগেল, শোপেনহাওয়ার কিংবা অন্য অনেক দার্শনিকের মতো, যা বলেন তা পালন করেন না বা করতে পারেন না। হেগেল সম্পর্কে তিনি বলেছেন :

> তিনি আমাকে এমন লোকের কথা মনে করিয়ে দেন যে সুরম্য প্রাসাদ তৈরি করে কিন্তু নিজে থাকে পাশের গুদামঘরে। একইভাবে মানুষের মন বাস করে মাথার খুলির মতো সাধারণ গৃহে।[২]

উপরের উদ্ধৃতাংশে সোকি হয়তো এই কথাই বলতে চাচ্ছেন, যে-সারধর্মবাদ বা পরমাত্মাবাদ হেগেল নির্মাণ করেছেন সেখানে তাঁর নিজেরই ঠাঁই নেই—সেখানে হেগেল তাঁর নিজেরই মূর্ত অস্তিত্ব খুঁজে পাবেন না। হেগেলের 'বিষয়গত সত্যে' (objective truth)† মানুষের ব্যক্তিগত জীবন অপ্রাসঙ্গিক। তাঁর 'মহান' ও 'সমুদয় ব্যাখ্যাদানকারী' দর্শন নির্মাণ করতে করতে তিনি ভুলেই গেছেন যে তিনি একজন মানুষ। একজন হেগেলিয়ান অধ্যাপক সম্পর্কে নিম্নে উদ্ধৃত সোকির সরস মন্তব্যগুলো লক্ষ করলে বিষয়টি প্রাঞ্জল হবে।

> স্থূলকায় Sir Professor যখন জীবনের সমগ্র রহস্যকে ব্যাখ্যা করেন, তখন বিহ্বল হয়ে তিনি নিজের নামটিই ভুলে যান; তিনি ভুলে যান যে তিনি একজন মানুষ, এর চেয়ে কিছু কমও নয় বেশিও নয়, বা তাঁর মনে থাকে না যে তিনি কোনো অনুচ্ছেদের চমৎকার $\frac{৩}{৮}$ অংশ নন।[††৩]
>
> Herr Professor কেবল কল্পনা করেন এবং তা নিয়ে বই লেখেন, কিন্তু নিজে কখনো করে দেখার চেষ্টা করেন না। কখনো তাঁর কাছে মনেই হয় না যে বিষয়টি বাস্তবায়িত করা উচিত। তিনি হচ্ছেন শুল্ক বিভাগের সেই কেরানীর মতো যে লিখে যায়, কিন্তু নিজে সে লেখা পড়তে পারে না, এবং লেখা হয়ে গেলেই দায়িত্ব শেষ হল মনে করে যে তৃপ্ত থাকে।[৪]

---

* এখানে মনে হতে পারে হেগেলকে কোনো গুরুত্বই দেন নি কিয়ের্কেগার্ড কিন্তু বিষয়টি আসলে ঠিক এরকম নয়। বরঞ্চ বুদ্ধিবাদী দর্শনের ক্ষেত্রে হেগেলকেই সবচেয়ে ক্ষমতাবান বলে মনে করতেন তিনি। এই বিষয়ে Copleson লিখেছেন, "...he regarded Hegel as the greatest of all speculative philosophers and as a thinker who had achieved a stupendous intellectual *tour de force*. But this, in Kierkegaard's opinion, was precisely the trouble with Hegelianism, namely that it was a gigantic *tour de force* and nothing more. Hegel sought to capture all reality in the conceptual net of his dialectic, while existence slipped through the meshes".[৫]

† বিষয়গত সত্য সমষ্টির জন্য সত্য কিন্তু ব্যক্তির জন্য সত্য নয়। 'আমিই সত্য' অধ্যায়ে এ সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয়েছে।

†† সোকির *Concluding Unscientific Postscript*-এ এরকমই এক হেগেলীয় চিন্তাবিদের কাল্পনিক উদ্ধৃতি আছে, "আমি একজন মানুষ কি না আমি জানি না কিন্তু আমি 'পদ্ধতিটি' বুঝেছি!" কিন্তু সোকির কথা হচ্ছে, আমি জানি যে আমি একজন মানুষ এবং আমি জানি যে আমি 'পদ্ধতি'টি বুঝি নি।[৬]

কিয়েৰ্কেগার্ডের মতো ফয়েরবাখও এ ধরনের প্রবণতার বিরোধিতা করেছেন। তাঁর কথা হচ্ছে : একজন মানুষ হওয়ার পরিবর্তে একজন দার্শনিক হতে চেয়ো না... একজন চিন্তাশীল মানুষের মতো চিন্তা কোরো না... জীবন্ত ও বাস্তবে অস্তিত্বশীল সত্তার মতো চিন্তা কর... অস্তিত্বের ভেতরে থেকে চিন্তা কর।[৭] বহু শতক আগে ডেনমার্ক থেকে অনেক দূরে, ভারতবর্ষের মাটিতে বসে মহামতি গৌতম বুদ্ধও প্রায় একইভাবে চিন্তা করেছিলেন। গভীর দর্শনালোচনায় না গিয়ে তাঁর জীবনের একটি ঘটনা উল্লেখ করলেই বিষয়টি স্পষ্ট হবে। একবার এক ভিক্ষু বুদ্ধের কাছ জানতে চাইলেন যে জগৎ বা মানুষ সম্পর্কে তাঁর পরিষ্কার ধারণা আছে কি না। বুদ্ধ উত্তর দিলেন : যদি কোনো বিষাক্ত তীর এসে তোমার শরীরে বিধঁত তা হলে কি ওই তীরটি কী দিয়ে তৈরি, বা বিষটি কী ধরনের কিংবা তীরটি কোন দিক থেকে এল, এসব তত্ত্বকথা তোমার মাথায় আসত? আসত না, তখন তুমি শুধু ভাবতে কী করে টান দিয়ে তীরটা বের করে ক্ষতের চিকিৎসা করবে। এটাই তোমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ অর্থাৎ বাস্তবে তোমার যে অস্তিত্বকে প্রত্যক্ষ করছ সেটা নিয়েই ভাব। জগৎ কিংবা মানুষ সম্পর্কে সাধারণ ধারণা তোমার জন্যে প্রয়োজনীয় নয়।[৮]

গৌতম বুদ্ধের মতো কিয়েৰ্কেগার্ডও ঈশ্বর, জগৎ, প্রকৃতি এবং অন্য সবকিছুর চেয়ে ব্যক্তিমানুষকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। তা হলে ব্যক্তিমানুষকে কোথায় পাওয়া যাবে? অথবা ব্যক্তিমানুষ বলতে আসলে কী বোঝায়? এসব প্রশ্নের কোনো সাদামাটা উত্তর কিয়েৰ্কেগার্ড দেন নি। তাঁর মতে মানুষের কাছে তার নিজের অস্তিত্বই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। নিজের অস্তিত্বকে জানতে চাইলে প্রত্যেক মানুষকে নিজেকেই চেষ্টা করতে হবে, কারণ কেবল নিজের পক্ষেই নিজ-অস্তিত্বকে সবচেয়ে ভালোভাবে জানা সম্ভব। সোকি বলেন, ব্যক্তিকে সংজ্ঞায়িত করা যায় না, কেবল সে-ই ভেতর থেকে নিজেকে জানতে পারে। একে কোনো বই বা তত্ত্বের ভেতর পাওয়া যাবে না। কাজ করতে করতে, কিংবা বেছে নিতে নিতে আমরা আমাদের নিজ-অস্তিত্বকে জানতে পারি। অর্থাৎ দুই বা ততোধিক জিনিসের মধ্যে আমরা যখন কোনো কিছু বেছে নিই, কিংবা গুরুত্বপূর্ণ কিছু করব বলে সিদ্ধান্ত নিই, তখনই আমরা নিজেদের মুখোমুখি হই, নিজেকে চিনতে পারি।

তা হলে আমাদের, মানুষদের, নিজেদের অস্তিত্ব আসলে কী? রক্তে-মাংসে, আনন্দে-বেদনায়, নানান বিষয় ও অনুভূতির টানাপড়েনে গড়ে উঠতে থাকে মানুষ। তাই তার অস্তিত্ব সীমায়িত পূর্ণ বা নির্দিষ্ট কিছু নয়। সে সবসময় নিজেকে অতিক্রম করে। সে সবসময় হয়ে ওঠে, তবে কী সে হয়ে উঠবে তা নিশ্চিত নয়।*

স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে ইট, কাঠ, কুকুর, বেড়াল ইত্যাদির মতো মানুষের অস্তিত্ব সম্পর্কে পূর্বধারণা লাভ করা যায় না। তাই ইট, কাঠ, কুকুর, বেড়ালের মতো ব্যক্তি-অস্তিত্বের প্রত্যয় (concept) নির্মাণ সম্ভব নয়। এখানেই মানুষের সঙ্গে অন্যান্য প্রাণী বা জড়বস্তুর পার্থক্য, হেগেলের কাছে এই পার্থক্য গুরুত্বপূর্ণ নয়। হেগেলীয় পদ্ধতিতে, চূড়ান্ত বিচারে,

---

* কিয়েৰ্কেগার্ডের বিখ্যাত উত্তরসূরি জঁ-পল সার্ত্র বলেছেন আমি সবসময় স্বাধীনভাবে কোনো-না-কোনো কিছু হয়ে উঠছি। আমি স্বাধীন—আমি আমার ইচ্ছেমতো কাজ করি বা চিন্তা করি। কিন্তু আমি আমার স্বাধীনতাকে বেছে নেই নি। এই স্বাধীনতা যেন জোর করে আমার ওপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, "আমি মুক্ত হওয়ার জন্য দণ্ডিত। এর অর্থ হচ্ছে স্বাধীনতা ছাড়া আমার স্বাধীনতার আর কোনো সীমারেখা নেই।" অন্যভাবে বলা যায়, আমরা আমাদের নিজেদের এই স্বাধীনতাকে হরণ করতে পারি না, অর্থাৎ আমাদের স্বাধীনতা হরণ করার ব্যাপারেও আমরা স্বাধীন নই।

এক অর্থে ব্যক্তি মানুষও একখণ্ড ইট, কিংবা একটি বেড়ালের মতো জাতি-রাষ্ট্রের বিশাল জৈব-শরীরে নগণ্য একটি কোষ মাত্র।

কিন্তু হেগেলের এই কথা আমরা সাধারণ মানুষরা কি মেনে নিতে পারব? আমরা তো স্পষ্টই দেখি অন্য সবকিছুর সঙ্গে আমাদের অনেক পার্থক্য। আমাদের আবেগ আছে, আকাঙ্ক্ষা আছে, অনেক কিছুই আমরা নিজেদের আবেগে, নিজেদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য করি : আমরা আমাদের পছন্দমতো জামা-কাপড় পরি, বাড়ি বানাই, গাড়ি কিনি, মানুষের উপকার করি, বিশ্বাসঘাতকতা করি, সংগ্রাম করি, বিদ্রোহ করি, বিপ্লব করি। হেগেল এসব অস্বীকার করেন নি, বরং তিনি মানুষের আবেগ ও আকাঙ্ক্ষার গুরুত্ব দিয়েছেন। তিনি এক জায়গায় বলেছেন, "পৃথিবীতে এ পর্যন্ত আবেগ ছাড়া কোনো মহান লক্ষ্য অর্জিত হয় নি।"

ব্যাপারটা বোঝার জন্য হেগেলীয় দর্শনের দু-একটি বিষয়ে একটু নজর দিতে হবে। হেগেল ঈশ্বরকে ভিন্ন রূপে দেখেছেন এবং ভিন্ন নামে ডেকেছেন। তাঁর ঈশ্বর হচ্ছেন প্রত্যয়গত সত্যের (conceptual truth) সমগ্রতা। ঈশ্বরকে তিনি কখনো 'absolute mind' বলেছেন, কখনো বা বলেছেন 'absolute spirit' আবার কখনো তাকে 'ultimate reality' আখ্যা দিয়েছেন। জ্ঞান, বিজ্ঞান, ধর্ম, রাজনৈতিক চিন্তা, ইতিহাস ইত্যাদি সবকিছুর প্রত্যয়ের এক জটিল ঐক্যই হচ্ছে এই 'absolute mind' কিংবা 'absolute spirit' বা 'ultimate reality'। এই 'absolute mind' আবার মানবীয় জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সকল স্তরে নিজেকে প্রকাশ করে। অনন্ত অসীম ঈশ্বর বা 'absolute mind' এক একটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক কালপর্বে সসীমরূপে আত্মপ্রকাশ করে। এভাবে যুগ যুগান্তর পেরিয়ে একটি নির্দিষ্ট উদ্দেশ্যে ও বিশেষ লক্ষ্যপানে ধেয়ে চলে ইতিহাস। এর ভবিষ্যৎ অর্থাৎ অসীম 'absolute mind' সম্পর্কে আমরা জানি না। আমাদের পক্ষে কেবল 'absolute mind'-এর যতটুকু ইতিমধ্যে সসীমভাবে প্রকাশিত হয়েছে ততটুকুই জানা সম্ভব।

'Absolute mind' আবার আপনার আমার মতো ব্যক্তিমানুষের মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করে না, সে প্রকাশিত হয় বিশাল জাতি-রাষ্ট্রে বা তার সংস্কৃতিতে।* হেগেলের দৃষ্টিতে আমরা, ব্যক্তি-মানুষরা, এই জাতি-রাষ্ট্রের বিশাল জৈব-শরীরের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র একেকটি কোষ মাত্র।

ফলে ব্যাপারটা কি এই দাঁড়াচ্ছে না যে আমরা আমাদের আবেগে, আমাদের আকাঙ্ক্ষা পূরণের জন্য খেয়ালখুশিমতো যা-যা করছি 'absolute mind' সেইসব বিচিত্র কর্মকাণ্ডের একটি জটিল ঐক্য তৈরি করে নিয়ে তার মধ্য দিয়ে একটি নির্দিষ্ট ঐতিহাসিক কালপর্বে নিজেকে সসীমভাবে প্রকাশ করছে। অর্থাৎ আমাদের আপাত স্বাধীন আবেগ ও আকাঙ্ক্ষা আসলে 'absolute mind'-এর লক্ষ্যপূরণের উদ্দেশ্যেই ব্যবহৃত হচ্ছে। শুধু তাই নয়, হেগেল বলেন, আমরা যে আবেগ অনুভব করি বা আকাঙ্ক্ষা পোষণ করি, পরোক্ষভাবে তাও 'absolute mind'-এর সৃষ্টি।

হেগেলের মতে আমাদের চিন্তা, মূল্যবোধ, বিশ্বাস, প্রবণতা সবই সাংস্কৃতিক সমগ্রতা (cultural totality) থেকে উদ্ভূত, আমরা সবাই এই সাংস্কৃতিক সমগ্রতার একেকটি ক্ষুদ্র অংশ হিসেবে তার ওপর নির্ভর করে বেঁচে আছি। তিনি মনে করেন আমরা 'জনতা'র চিদাত্মাকে (spirit) বহন করে চলেছি, আমরা সবাই সময়ের সঙ্গে পরিবর্তনশীল সংস্কৃতির

---

* হেগেলের মতে 'absolute mind' জাতি-রাষ্ট্র ছাড়াও কিছু 'মহান' ঐতিহাসিক ব্যক্তির মধ্যে নিজেকে প্রকাশ করে। বলাই বাহুল্য এই 'মহান' ব্যক্তিদের সঙ্গে সোকির 'ব্যক্তিমানুষের' কোনো মিল নেই।

বাহক মাত্র। এক জায়গায় তিনি লিখেছেন, 'মানুষের যা কিছু মূল্যবান তাকে এবং তার সমস্ত চিদাত্মিক (spiritual) বাস্তবতাকে সে রাষ্ট্রের মধ্য দিয়ে পায়।' তাই, সোকির মতে, হেগেল মানুষের আবেগ, আকাঙ্ক্ষা ইত্যাদি স্বীকার করলেও চূড়ান্ত বিচারে অন্যান্য ইতর প্রাণী বা জড় বস্তুর মতো ব্যক্তিমানুষকেও প্রত্যয়ে (concept) আবদ্ধ করে ফেলেছেন। এখানেই কিয়ের্কেগার্ডের আপত্তি। তিনি বলেছেন, এতে ব্যক্তিমানুষকে হেয় করা হয়েছে। ১৮৫০ সালে লেখা সোকির জার্নালের কিছু অংশের সংক্ষিপ্ত রূপ এরকম :

> আমি কতবার দেখিয়েছি যে মৌলিকভাবে হেগেল মানুষকে ম্লেচ্ছ বানিয়েছেন, তাদেরকে প্রজ্ঞাসম্পন্ন পশুর গোষ্ঠীতে রূপান্তরিত করেছেন। কারণ পশুজগতে একটি একক সত্তা সবসময়ই তার গোষ্ঠী থেকে কম গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু মানবগোষ্ঠীর বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই, যেহেতু ব্যক্তিমানুষকে ঈশ্বরের আদলে তৈরি করা হয়েছে, তাই ব্যক্তিমানুষ সবসময়ই তার গোষ্ঠী থেকে বড়।[৯]

হেগেলের লক্ষ্য ছিল বিষয়গত সত্য। তিনি তাঁর দর্শনে বিশ্বের তাবৎ বিষয়কে প্রণালীবদ্ধ করার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু মানুষকে যা সর্বদা তাড়িত, ব্যথিত, মথিত, আনন্দিত করে অর্থাৎ তার নিজের ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখ, আশা-আকাঙ্ক্ষা, উদ্বেগ-আশঙ্কা, উদ্যম-হতাশা, নৈতিকতা-অনৈতিকতা ইত্যাদি কোনো কিছুকেই তেমন গুরুত্ব দেন নি। এ কারণেই কিয়ের্কেগার্ডের কাছে হেগেলীয় দর্শন অসার বলে প্রতীয়মান হয়। তিনি বলেন :

> বিষয়গত সত্য আবিষ্কার করে কী হবে? কী হবে দর্শনের এতসব পদ্ধতি নিয়ে কাজ করে?... এমন একটা জগৎ নির্মাণ করে কী লাভ যেখানে আমি বাস করি না?[১০]

যদিও সোকির আক্রমণের প্রত্যক্ষ শিকার হেগেল, প্রকৃত অর্থে কোনো বুদ্ধিবাদী দার্শনিকই সোকির হাত থেকে রেহাই পান নি। যেমন তিনি দেকার্তকেও সরাসরি আক্রমণ করেছেন। দেকার্ত 'আমি চিন্তা করি তাই আমি অস্তিত্বশীল' (cogito ergo sum) —এ কথা বলে আপন সত্তার অস্তিত্বকে বিষয়গতভাবে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছিলেন, কিয়ের্কেগার্ড দেকার্তকে সমালোচনা করে বললেন, "যেহেতু আমি অস্তিত্বশীল এবং যেহেতু আমি চিন্তা করি তাই আমি ভাবি যে আমি অস্তিত্বশীল।" "চিন্তা করার জন্য আমাকে অতি অবশ্যই অস্তিত্বশীল হতে হবে।"[১১]

সব বুদ্ধিবাদী দার্শনিকই মানুষের অস্তিত্বের চেয়ে মানুষের নির্যাসকে (Essence) বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। তাঁরা নির্যাস দিয়েই মানুষকে সংজ্ঞায়িত করেছেন, তাকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেছেন। সোকির কথা হচ্ছে : যে নির্যাসকে আশ্রয় করে আমি তৈরি হয়েছি বলে কল্পনা করা হয় সেই নির্যাসের চেয়ে, বা আমাকে যেভাবে সংজ্ঞায়িত করা হয়, সেই সংজ্ঞার চেয়ে, অথবা বিজ্ঞান, দর্শন, ধর্ম কিংবা রাজনীতি আমাকে যেভাবে ব্যাখ্যা করে সেই ব্যাখ্যার চেয়ে, একটি সচেতন সত্তা হিসেবে আমার অস্তিত্ব অনেক গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আমাকে সংজ্ঞায়িত করার সকল প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে, একটি সচেতন সত্তা হিসেবে আমার অস্তিত্বকে দাঁড় করান। আমার অস্তিত্ব যেন প্লেটোর নির্যাসে (Form) আবদ্ধ হয়ে না পড়ে, আমি যেন কার্তেজীয় মানসিক বিষয়ে পর্যবসিত না হই, বা সংস্কৃতির স্পিরিটকে (spirit) বহন করার জন্য আমি যেন কেবলমাত্র একজন হেগেলীয় বাহকে পরিণত না হই, অথবা বৈজ্ঞানিক প্রভাবে আমি নিজেকে যেন কেবল একটি স্নায়ু-যন্ত্র ভাবতে শুরু না করি, কিংবা আমি যেন কেবল একটি সামাজিক নিরাপত্তা সংখ্যা হিসেবে চিহ্নিত না হই, সেজন্য সোকি আমাকে

সংজ্ঞায়িত করার, আমাকে সীমাবদ্ধ করার, আমাকে পরাধীন করার এই সব প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে আমার অস্তিত্বকে দাঁড় করান এবং এই সবকিছুর ওপর আমার অস্তিত্বকে স্থান দেন। ধ্রুপদী ও আধুনিক বুদ্ধিবাদ যেখানে যৌক্তিক নির্যাস বা স্বতঃসিদ্ধ ধারণাগুলোকে ব্যক্তি-অস্তিত্বের চেয়ে বেশি গুরুত্ব দেয়, এবং মনে করে যে ব্যক্তি কেবল তার নির্যাস বা ধারণার মধ্যেই তার বাস্তবতা বা অর্থ খুঁজে পাবে, সোকি সেখানে ব্যক্তির অস্তিত্বকে বেশি গুরুত্ব দেন। বুদ্ধিবাদ যেখানে দাবি করে যে কেবল নির্যাস (Form) বা ধারণার (Concept) মাধ্যমেই ব্যক্তিকে জানা সম্ভব সেখানে সোকি মনে করেন, কোনো ধরনের নির্যাসে বা ধারণায় বা ধারণাগত পদ্ধতিতে বা প্রণালীবদ্ধ দর্শনে ব্যক্তির অস্তিত্বকে অনুধাবন করা সম্ভব নয়।

তাই বুদ্ধিবাদীদের কেউ কেউ ব্যক্তির অস্তিত্ব নিয়ে চিন্তিত হলেও তাঁদের দর্শনের প্রণালীবদ্ধতার কারণে সেখান থেকে ব্যক্তি-অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়ে গেছে। প্রণালীবদ্ধ দর্শনে ব্যক্তির প্রসঙ্গ এলে তা ব্যক্তির প্রত্যয় হিসেবে আসে, ব্যক্তির অস্তিত্ব সেখানে ধরা দেয় না। কিন্তু, সোকির মতে, ব্যক্তি-অস্তিত্বকে প্রত্যয়ে রূপান্তর করা যায় না। একটি প্রত্যয় একটি সম্ভাবনা, বা বড়জোর, কান্টের ভাষায়, একটি বিধি মাত্র। কিন্তু মানুষের অস্তিত্ব হচ্ছে ওই বিধির প্রয়োগ, সম্ভাবনার বাস্তব উদাহরণ। হেগেল তাঁর দর্শনে প্রত্যয়ের যৌক্তিক বিকাশে ব্যক্তি-অস্তিত্বকে ধরতে চেয়েছেন ঠিকই কিন্তু সেখানে কেবল ব্যক্তির প্রত্যয়ই পাওয়া যায়, তার অস্তিত্ব বরাবরের মতোই দূর অস্ত্।

সোকি সক্রেটিসের অপ্রণালীবদ্ধ দর্শনের অনুরাগী ছিলেন। তিনি মনে করতেন প্রণালীবদ্ধ না হওয়ার কারণেই সক্রেটিক দর্শনে ব্যক্তি-অস্তিত্ব প্রাধান্য পেয়েছে। সক্রেটিসের পরে দর্শন প্রণালীবদ্ধ হয়ে যাওয়ার কারণে সেখানে ব্যক্তি কেবল তার প্রত্যয় হিসেবে উপস্থিত হয়েছে, তার আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনা, উদ্বেগ-আশঙ্কা, ভয়-ভীতি, উদ্যম-হতাশা, নৈতিকতা-অনৈতিকতা, আবেগ-অনুভূতি ইত্যাদির ঠাঁই মেলে নি। ফলে হেগেলীয় কিংবা অন্য যে কোনো বুদ্ধিবাদ খুব সাধারণ, কিন্তু ব্যক্তিমানুষের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, 'আমি কী করব?'—এই প্রশ্নের উত্তর দিতে ব্যর্থ হয়। প্রণালীবদ্ধ যুক্তিবাদ বা বুদ্ধিবাদে মানুষের জ্ঞানাত্মক সত্তার ব্যাখ্যা লাভ সম্ভব কিন্তু সেখানে তার আপন অস্তিত্ব কিংবা তার নৈতিক সত্তার স্বরূপ সন্ধান বৃথা।সোকি লিখেছেন :

> জ্ঞানাত্মক সত্তার জন্য যুক্তিবিজ্ঞান উপযুক্ত, কিন্তু নৈতিক সত্তার ক্ষেত্রে যুক্তিবিজ্ঞান কোনো ভূমিকাই পালন করতে পারে না...।[১২]

সোকি অত্যন্ত শঙ্কার সঙ্গে সাধারণ মানুষের মধ্যে হেগেল ও অন্যান্য বুদ্ধিবাদীর প্রভাব লক্ষ করেছিলেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে যত দিন যাচ্ছে মানুষ ততই বুদ্ধিবাদী হয়ে উঠছে। সে দুয়োরানী আবেগকে নির্বাসন দিয়ে সুয়োরানী যুক্তিকে নিয়ে মেতে আছে।

> এ যুগে মানুষের বিদ্যাবুদ্ধি বেড়েছে, সবকিছুকেই সে তার বুদ্ধি দিয়ে বিচার করতে চায়। কিন্তু সে ভুলে গেছে প্রগাঢ় ভাবাবেগ নিয়ে সে কী করে জীবন-যাত্রা নির্বাহ করবে...।[১৩]

সোকি যদি এখন এই বিংশ শতাব্দীর শেষে এসে জন্মাতেন তো আরো শঙ্কিত হতেন। আগের মতো মানুষ আর হেগেলের মতো দার্শনিকদের দ্বারা প্রত্যক্ষভাবে প্রভাবিত হয় না ঠিকই, তবে এখনকার বিজ্ঞানের সংখ্যায়ন (quantification) কিংবা সামাজিক ও রাজনৈতিক তত্ত্বের বিমূর্তায়নের ফলে মানুষের অস্তিত্ব আরো সংকটাপন্ন হয়েছে। দর্শন, বিজ্ঞান কিংবা সামাজিক, রাজনৈতিক বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান দ্বারা মানুষের মূর্ত অস্তিত্ব

অবহেলিত হচ্ছে। কলেজের নবাগত কোনো ছেলে, দুধওয়ালা, পার্লামেন্টের সদস্য, ফুটপাতের ভাসমান মানুষ, নিশিরাতে কর্তব্যরত নর্স, বানভাসি উদ্বাস্তু, মাতাল কবি—সচেতন সত্তা হিসেবে এদের আলাদা কোনো অস্তিত্ব আছে বলে কি স্বীকার করে নেওয়া হয়? তারা তো বিমূর্তভাবে দর্শনের বৌদ্ধিক পদ্ধতির অংশ হয়ে যায়। বিজ্ঞানের হাইপোথেসিস এবং পরিসংখ্যানে তালিকাভুক্ত হয়, আমলাতন্ত্র এবং বাণিজ্যিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানসমূহ দ্বারা গৃহীত নীতি, জরিপ কিংবা গণনায় একটি ক্ষুদ্র বা বিমূর্ত বিষয় হিসেবেই গণ্য হয়। বিজ্ঞানের হাইপোথেসিস কিংবা পরিসংখ্যানে, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক বিমূর্ত তত্ত্বে অথবা দর্শনের বিশুদ্ধ চিন্তার সঙ্গে ব্যক্তি-অস্তিত্বের সঙ্কটের কোনো যোগ নেই।

পার্মেনিদেসের* পর হেগেল পর্যন্ত চিন্তা ও সত্তাকে এক করে দেখার যে দীর্ঘ ঐতিহ্য চলে আসছিল কিয়ের্কেগার্ড এর প্রতিবাদ করেন। তাঁর মতে চিন্তার সঙ্গে সত্তা ও বাস্তবতার কোনো মিল নেই। অস্তিত্বশীল ব্যক্তি যে অস্তিত্ব-সঙ্কটের মুখোমুখি হয় তা সত্যিকারার্থে বিশুদ্ধ চিন্তার ভাষায় প্রকাশ করা যায় না এবং ওই ভাষায় তা ব্যাখ্যা করা আরো দুরূহ। কারণ বিশুদ্ধ চিন্তা মূর্ত ও ক্ষণস্থায়ী বিষয় এবং অস্তিত্ববাদী প্রক্রিয়াকে অবহেলা করে, অস্তিত্বশীল ব্যক্তির সত্তার অস্তিত্বে অবস্থিত ক্ষণস্থায়ী ও শাশ্বত বিষয়ের সংশ্লেষণ থেকে উদ্ভূত তার দুর্দশাকে উপেক্ষা করে।

উদ্ধৃতাংশের শেষ কয়টি শব্দতেই সম্ভবত সোকির ধারণা পরিষ্কার হয়ে যায়। মানুষ স্ববিরোধীর মতো শাশ্বত ও ক্ষণস্থায়ীকে, অসীম ও সসীমকে নিজের ভেতর যুক্ত করার যে চেষ্টা করে† তা কখনো চিন্তার সাহায্যে উপলব্ধি করা যায় না অথবা চিন্তা কখনো মানবীয় সত্তার এই দুটো দিককে এক করতে পারে না। অস্তিত্ব কোনো ধারণা (idea) বা নির্যাস (essence) নয়, ফলে বৌদ্ধিকভাবে তাকে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। কোনো মানুষ যদি জাতি-রাষ্ট্রের বিশাল জৈব শরীরে বা চিন্তার যৌক্তিক পদ্ধতিতে নিজেকে হারিয়ে যেতে দেয় তো সত্যিকার অর্থে সে আর মানুষ থাকে না। কেবল অস্তিত্বশীল হয়ে, সে যা সেরকম-ভাবে, একজন অনন্য মানুষ হিসেবে সমুজ্জ্বল থেকে, কিংবা কোনো পদ্ধতিতে মিলে না যাওয়ার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা পালন করে, একজন মানুষ তার সত্তাকে পরিপূর্ণ করতে পারে।

সোকি বলেন, এখন প্রায় কোনো মানুষই আর তার সত্তাকে পরিপূর্ণ করতে পারে না। বেশির ভাগ মানুষই এখন ভোগী-জীবনকে বেছে নিয়ে, কিংবা বুদ্ধিবৃত্তিতে আশ্রয় নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার কষ্ট থেকে অব্যাহতি লাভ করতে চাইছে। যে ভোগী-জীবন যাপন করে সে আবেগময়তায় ও কল্পনায় কেবল সম্ভাবনার সঙ্গে বাস করে, কোনো কিছুই দায়িত্বের সঙ্গে করে না এবং যে বৌদ্ধিক জগতে বাস করে সে নিজে বিচ্ছিন্ন থেকে অন্য সবকিছুকে একটি পদ্ধতির প্রেক্ষাপটে বিচার করতে চায়। কেউ আর বিষয়ীগতভাবে চিন্তা করতে চায় না। সবাই এখন খুব হাস্যকরভাবে সবকিছু বিষয়গত দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখতে চায়। কিয়ের্কেগার্ড তাঁর *Concluding Unscientific Postscript*-এ একজন মহিলার কথা বলেছেন। মহিলাটির স্বামী নিজে খ্রিষ্টান কি না সে বিষয়ে সন্দিহান। স্বামীর সন্দেহভঞ্জনের

---

* পার্মেনিদেস দক্ষিণ ইতালির ইলিয়া শহরে জন্মগ্রহণ করেন। ৪৬৫ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে তাঁর মতবাদ বেশ পরিচিতি লাভ করে। তিনি বলেছিলেন সত্য এক, অভিন্ন, অপরিবর্তনীয় এবং প্রজ্ঞা দ্বারা বোধগম্য।

† কিয়ের্কেগার্ড এক জায়গায় লিখেছেন, "অসীম ও সসীম, শাশ্বত ও ক্ষণস্থায়ীর মিলনে যে শিশুর জন্ম হয় তা-ই অস্তিত্ব; এ কারণে অস্তিত্ব মানেই নিরন্তর লড়াই।[১৪]

জন্য মহিলা যে যুক্তিগুলো দেখায় তা হচ্ছে :

> প্রিয় স্বামী, তুমি কীভাবে ভাবতে পার যে তুমি খ্রিস্টান নও? তুমি কি একজন দিনেমার নও এবং ভৌগোলিক অবস্থান কি বলে দেয় না যে ডেনমার্কের প্রধান ধর্ম হচ্ছে লুথারিয়ান খ্রিস্টধর্ম? কারণ তুমি নিশ্চয়ই একজন ইহুদি নও, বা একজন মুসলিমও নও; তা হলে একজন খ্রিস্টান না হয়ে তুমি আর কী হতে পার? হাজার বছর আগেই ডেনমার্ক থেকে প্যাগানবাদ বিতাড়িত হয়ে গেছে। তাই আমি জানি যে তুমি প্যাগান নও। তুমি কি অফিসে একজন সচেতন সিভিল সার্ভেন্ট হিসেবে কাজ করছ না; তুমি কি একটি খ্রিস্টীয় জাতির, একটি লুথারিয়ান খ্রিস্টীয় রাষ্ট্রের একজন ভালো নাগরিক নও? তা হলে তুমি অতি অবশ্যই একজন খ্রিস্টান।[১৫]

সোকি আরেক জায়গায় লিখেছেন :

> কেউ আর বাঁচে না, কাজ করে না, বিশ্বাস করে না, কিন্তু সে জানে ভালবাসা ও বিশ্বাস কী, সে এটা জানে কেবল একটি পদ্ধতির ভেতর তার অবস্থান নির্ধারণ করার জন্য।"[১৬]

কিন্তু আধুনিক সমাজ, রাষ্ট্র, বিজ্ঞান, অর্থনীতি এসব নিয়ে চিন্তিত নয়। এসব প্রতিষ্ঠানের চাপে মানুষ আরো বেশি যৌক্তিক ও বৌদ্ধিক হওয়ার চেষ্টা করছে। এতে তার কী লাভ, সে জানে না। তার ব্যক্তি-অস্তিত্ব অস্তিত্বশীল কি না, এ ব্যাপারেও সে সচেতন নয়। সে জানে না সে কেন বাঁচে, কেনই-বা নিরন্তর ছুটে মরে।

বিংশ শতাব্দীর বিখ্যাত ঔপন্যাসিক Antoine de Saint-Exupery তাঁর অসাধারণ বই *The Little Prince*-এ এই বিষয়টি খুব চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন। এখানে শুধু ভিন্ন গ্রহ থেকে আসা ছোট্ট রাজকুমার পৃথিবীর মানুষ সম্পর্কে যে মন্তব্য করে তা লক্ষ করা যাক :

> "Men", said the little prince, "set out on their way in express trains, but they do not know what they are looking for. Then they rush about, and get excited, and turn round and round...."[১৭]
>
> "Only the children know what they are looking for", said the little prince, "they waste their time over a rag doll and it becomes very important to them; and if anybody takes it away from them, they cry..."[১৮]

এই অদ্ভুত অবস্থা থেকে ব্যক্তিমানুষকে উদ্ধার করার জন্য সভ্যতার 'ত্রাতা' বলে কথিত হেগেল কিংবা তাঁর মতো অন্য কোনো দার্শনিক এগিয়ে আসেন নি, বরং তারা সুগঠিত পদ্ধতি ও সূক্ষ্ম যুক্তি-জালে আমাদেরকে আরো দিশেহারা করে ফেলেছেন। তাঁরা উপলব্ধিই করতে পারেন নি যে আমাদের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে আমরা কী করব এবং কেন করব সে সম্পর্কে স্পষ্ট ধারণা লাভ করা, আমাদের জন্য সবচেয়ে জরুরি হচ্ছে নিজেদের জীবনের অর্থ অনুধাবন করা।

> আমার যা অভাব তা হচ্ছে, আমার কী করতে হবে তা আমার কাছে পরিষ্কার নয়, আমার কী জানতে হবে সেটা আমার জন্য গুরুত্বপূর্ণ নয়, আমাকে এমন একটি সত্য খুঁজে পেতে হবে যা কেবল আমার জন্য সত্য, আমাকে এমন একটি ধারণা (idea) পেতে হবে যার জন্য আমি বাঁচব এবং মরব।[১৯]

যে সত্য কেবল আমার জন্য সত্য তা বিষয়গত সত্য (objective truth) হতে পারে না। কারণ বিষয়গত সত্যে ব্যক্তি-অস্তিত্ব উপস্থিত থাকে না। ফলে স্বভাবতই, সোকি যখন সত্য সন্ধান করেন তিনি 'বিষয়গত সত্য'-র প্রতি আগ্রহী হন না। তাঁর অভীষ্ট হয় এমন এক সত্য যার সঙ্গে তাঁর নিজের সম্পর্ক আছে, যে সত্য-চিন্তায় তিনি নিজ অস্তিত্ব অনুভব করেন। তাঁর মনোযোগের কেন্দ্র হয়ে দাঁড়ায় এমন বিষয়ীগত মূর্ত সত্য যে সত্যচিন্তার সঙ্গে চিন্তনকারীর সম্পর্ক থাকে।

তথ্যসূত্র :

১. Kierkegaard, Søren, 1941. *Concluding Unscientific Postscript,* trans. D. F. Swenson and Walter Lowrie, Princeton, Princeton University Press, p. 275, উদ্ধৃত, Blackham, H. G. 1952 (rpt. 1994), *Six Existential Thinkers,* London and New York, Routledge, p. 3

২. Solomon, Robert C., 1989, *From Hegel To Existentialism,* Oxford, Oxford University Press, p. 72.

৩. Gaarder, Jostein, 1996, *Sophie's World,* New York, Berkley Books, p. 379.

৪. *Concluding Unscientific Postscript, Book II, Part 2, Chap. 3* উদ্ধৃত, Hartman, James B. (ed.), 1967, *Philosohpy of recent times, Vol. 1,* NewYork, McGraw-Hill Book Company, p. 235.

৫. Copleston, Frederick, 1971. *A History of Philosophy, Vol. VII,* London, Search Press, p. 335

৬. *Concluding Unscientific Postscript,* Book II, Part 2, Chap 3. উদ্ধৃত, Hartman, James B. (ed.), 1967, *Philosophy of recent times, Vol. 1,* New York, McGraw-Hill Book Company, p. 252

৭. Stumf, Samuel Enoch, 1975 (second edn., *Socrates to Sartre,* New York, McGraw-Hill Book Company, p. 462

৮. *Sophie's World,* p. 380

৯. Kierkegaard, Søren, 1958, *The Journals of Søren Kierkegaard,* select., ed, and trans. Alexander Dru, Fontana Paperback, p. 87, উদ্ধৃত, Brown, Colin, 1969, *Philosophy and the Christian Faith,* London, The Tyndale Press, p. 128

১০. *From Hegel to Existentialism,* p. 74

১১. Datta, Dhirendra Mohan, 1970, *The Chief Currents of Contemporary Philosophy,* third edition, Calcutta, Calcutta University Press, p. 314.

১২. সঞ্জীব ঘোষ (সম্পা.), ১৯৮৬, *অস্তিবাদ দর্শনে ও সাহিত্যে,* কলকাতা, পৃ. ১৫

১৩. Ibid., পৃ. ১৩

১৪. *A History of Philosophy, Vol. VII,* p. 348

১৫. *Philosophy of recent times,* p. 228

১৬. Blackham, H. J., 1952 (rpt. 1994), *Six Existential Thinkers,* London and New York, Routledge, p. 10

১৭. Saint-Exupéry, Antoine de, 1974, *The Little Prince,* trans. Katherine Woods, London, Piccolo Books in association with Heinemann, p. 78

১৮. Ibid., p. 73

১৯. Kierkegaard, Søren, 1938, *Journals,* trans. A. Dru, Oxford, Oxford University Press, August I. 1835, উদ্ধৃত, *From Hegel to Existentialism,* p. 73

"আমিই সত্য"

Kierkegaard had to re-open the whole question of the meaning of truth...his stand on the question may well have marked a turning point in European philosophy.

— William Barrett

হৃদয়ে এমন কিছু যুক্তিবৃত্তি আছে যা খোদ যুক্তিও জানে না

—পাস্কাল

পাস্কাল যেমন, তেমনি অনেক দার্শনিক কিয়ের্কেগার্ডের বহু আগে থেকেই বিষয়গত (objective) ও বিষয়ীগত (subjective) সত্য নিয়ে ভেবে আসছেন, এদেরকে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন। তবে তাঁদের ধারণাসমূহ এত বিচিত্র যে আমরা, সাধারণ মানুষরা, ধন্দে পড়ে যাই। শুধু যে এক-এক পণ্ডিত বিষয়টির এক-এক ব্যাখ্যা প্রদান করেছেন তাই নয়, কখনো কখনো একই দার্শনিক নানান জায়গায় নানাভাবে বিষয়টিকে উপস্থাপন করেছেন। যেমন কাণ্ট কখনো বলেছেন যে বিষয়গত বিষয় হচ্ছে বস্তুগত, এবং বিষয়ীগত বিষয় হচ্ছে মানসিক; আবার কখনো বলেছেন, বিষয়গত বিষয় হচ্ছে সর্বজনীন এবং বিষয়ীগত বিষয় হচ্ছে তা-ই যা কেবল একজন ব্যক্তি বিশ্বাস করেন বা অনুভব করেন। কাণ্টের এবংবিধ সংজ্ঞায় স্পষ্ট বোঝা যায় না যে এই 'বিষয়গত সত্য' কি কিছু বিশেষ বিষয়ী (subject) থেকে স্বাধীন, না যে-কোনো বিষয়ী থেকে স্বাধীন। উপরন্তু কাণ্ট কখনো কখনো "বিষয়গত সত্য" বলতে "বৈজ্ঞানিক সত্য"-কে বুঝিয়েছেন যেখানে অভিজ্ঞতাজাত সত্যও আছে আবার a priori* সত্যও আছে। কিন্তু হেগেল এসে বললেন, বিষয়গত সত্য মানেই সর্বজনীন দার্শনিক সত্য এবং তা নিহিত থাকে কেবল প্রত্যয় (concept) বা ভাবে (idea)।

কিন্তু আমরা তো দেখেছি অস্তিত্ব, বিশেষ করে ব্যক্তি-অস্তিত্বকে প্রত্যয়ে পরিণত করতে গেলেই তা বিমূর্ত হয়ে যায়। এবং আমাদের পক্ষে অস্তিত্ব থেকে যাত্রা শুরু করে হয়তো তার বিমূর্ত প্রত্যয়ে পৌঁছানো সম্ভব, কিন্তু বিমূর্ত প্রত্যয় থেকে শুরু করলে আমরা

---

* এক ধরনের জ্ঞান বা জ্ঞানের অন্যতম উপাদান যা ইন্দ্রিয়জাত অভিজ্ঞতার উপর নির্ভরশীল নয়। এ ধরনের জ্ঞান ইন্দ্রিয়জাত অভিজ্ঞতা থেকে উৎসারিত বা তা দ্বারা পরিবর্তিত হয় না। মনে করা হয় যে এরকম জ্ঞানের অনপেক্ষ নিশ্চয়তা (absolute certainty) আছে।

কখনোই অস্তিত্বের নাগাল পাব না। এই বিষয়ে *Philosophical Fragments*-এ কিয়েৰ্কেগার্ডের নিজের দেওয়া একটি উদাহরণ লক্ষ করা যাক। তিনি লিখেছেন : যদি নেপোলিয়নের 'মহান' কাজগুলো দিয়ে নেপোলিয়নের অস্তিত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়, তা হলে ব্যাপারটা কি খুব উদ্ভট হয়ে যাবে না? তাঁর অস্তিত্ব দিয়ে তাঁর কাজকে ব্যাখ্যা করা যায়, কিন্তু তাঁর কাজ তাঁর অস্তিত্বের প্রমাণ নয়। নেপোলিয়ন কেবল একজন ব্যক্তিমানুষ, তাই তাঁর সঙ্গে তাঁর কাজের কোনো অনপেক্ষ সম্পর্ক নেই; এই একই কাজ হয়তো অন্য কোনো লোক করতে পারত। সম্ভবত এই কারণেই আমার পক্ষে কাজ থেকে অস্তিত্বে যাওয়া সম্ভব নয়।[১]

এবার আমাদের দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার দিকে দৃষ্টি ফেরানো যাক। আমরা যদি একটি আমের প্রত্যয় নিয়ে ভাবি, তা হলে সেই ভাবনায় কোনো একটি আমের বিশেষ বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ কোনো একটি বিশেষ আমের রং, সুঘ্রাণ, স্বাদ, ওজন আকৃতি ইত্যাদির কোনো কিছুই ধরা দেবে না। কারণ আমের প্রত্যয় মানেই আমের এমন সাধারণ কিছু বৈশিষ্ট্য যেগুলো সব আমে থাকে। ফলে প্রত্যয় তৈরি করতে গেলেই বাস্তবতাকে বর্জন করতে হয়, কিংবা উল্টোভাবে বলা যায় বাস্তব অস্তিত্বকে পরিবর্তন করে অসম্ভব কোনো বিষয়ে পরিণত করতে না পারলে তাকে প্রত্যয়ে পরিণত করা যায় না। মানুষ তার চিন্তার মাধ্যমে বাস্তব অস্তিত্বকে একটি প্রত্যয়ে পরিণত করে, অথবা এভাবেও বলা যায়—চিন্তার কারণেই বাস্তব অস্তিত্ব প্রত্যয়ে পরিণত হয় এবং এভাবে চিন্তা করতে করতে একজন মানুষ এমনকি নিজেকেও হারিয়ে ফেলে। বিমূর্ত চিন্তা চিন্তাকারী ছাড়া চিন্তা। এই বিমূর্ত বা বিষয়গত চিন্তা, চিন্তা ছাড়া আর সবকিছুকেই উপেক্ষা করে। এবং চিন্তা, কেবল চিন্তাই হয়ে পড়ে তার নিজের মাধ্যম।

> বিষয়গত চিন্তার যে পদ্ধতি তা বিষয়কে একটি আকস্মিক বস্তুতে পরিণত করে, এবং এভাবে অস্তিত্বকে একটি অপসৃয়মাণ তুচ্ছ জিনিসে রূপান্তর করে...। এটার লক্ষ্য হচ্ছে নানান ধরনের বিমূর্ত চিন্তা, গণিত ও ঐতিহাসিক জ্ঞান, এবং এটা সবসময়ই বিষয়ীকে পেছনে ফেলে যায় এবং এর ফলে বিষয়গত দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়ীর অস্তিত্ব কিংবা অনস্তিত্ব খুবই তুচ্ছ জিনিসে পরিণত হয়। এজন্য হ্যামলেটকে খুবই সঠিক মনে হয় যখন তিনি উচ্চারণ করেন যে অস্তিত্ব কেবল বিষয়ীগতভাবে অর্থপূর্ণ হয়।[২]

কিয়েৰ্কেগার্ডের মতে, চিন্তা ও সত্তা এবং ভাবনা ও বাস্তবতা কখনোই এক হতে পারে না। তিনি বলেন : চিন্তার ভেতরে অস্তিত্বকে খুঁজতে গেলে বিষয়টি পরস্পরবিরোধী হয়ে যাবে কারণ চিন্তা অস্তিত্বকে বাস্তবতা থেকে দূরে সরিয়ে নেয়। চিন্তা যখন অস্তিত্বকে নিয়ে ভাবে তখন সে তার বাস্তবতাকে খারিজ করে দেয় এবং তাকে অসম্ভবের বলয়ে রূপান্তর করে।[৩]

কিয়েৰ্কেগার্ড তাঁর এই বক্তব্যকে আরো স্পষ্ট করেছেন একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের উদাহরণ দিয়ে। বাস্তবে জ্যামিতিকভাবে বিশুদ্ধ কোনো সমদ্বিবাহু ত্রিভুজের অস্তিত্ব নেই। আমি কেবল তখনই জ্যামিতিকভাবে বিশুদ্ধ একটি সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ আঁকতে পারব যখন আমি বাস্তবতাকে বর্জন করব। সোকি কি এখানে ভাববাদী দার্শনিক প্লেটো দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন? সোকি যেমন প্রত্যয় (Concept) ও বাস্তবে অস্তিত্বশীল বস্তুর পার্থক্য দেখিয়েছেন প্লেটোও একইভাবে তাঁর আকারের (Form) সঙ্গে, যে-বস্তুজগতে আমরা বাস করি সেই জগতের পার্থক্য দেখিয়েছিলেন। তবে সোকি যাকে বাস্তব অস্তিত্ব বলছেন প্লেটো তাকে বাস্তব বলেন নি; তাঁর কাছে তাঁর আকারই (Form) বাস্তব এবং আমাদের বস্তুজগৎ অবাস্তব।

যাই হোক, প্রত্যয় ও বাস্তবতার এই পার্থক্য লক্ষ করেই হয়তো কাণ্ট বলেছিলেন, আমরা যদি বাস্তবতাকে খুঁজে পেতে চাই তবে বিমূর্ত প্রত্যয় থেকে যাত্রা শুরু করা ভুল হবে। কিন্তু পরবর্তীকালে হেগেল কিংবা অন্য বুদ্ধিবাদী দার্শনিকরা এ কথা মানেন নি। যেমন হেগেল তাঁর পদ্ধতির ভিত্তি হিসেবে বিমূর্ত প্রত্যয় *spirit* কে ব্যবহার করেছেন, শোপেনহাওয়ার ব্যবহার করেছেন তাঁর *will* এবং বস্তুবাদীরা---বস্তু।

কাণ্টের সূত্র ধরেই কিয়ের্কেগার্ড বুদ্ধিবাদীদেরকে তীব্র আক্রমণ করলেন। তিনি বললেন, আমাদেরকে অবশ্যই অস্তিত্ব বিষয়ে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে শুরু করতে হবে। এভাবে শুরু করতে হলে 'বিষয়ীগত পদ্ধতি'র ব্যবহার প্রয়োজন, তবে এক্ষেত্রে কিছু সমস্যাও আছে। কিয়ের্কেগার্ড লিখেছেন :

> সাধারণভাবে মনে করা হয় যে বিষয়ীগত হওয়ার জন্য কোনো সৃজনীক্ষমতা কিংবা দক্ষতা অর্জনের প্রয়োজন নেই। এটা সত্য যে প্রত্যেক মানুষ এক অর্থে কিছু না কিছু বিষয়ী (subject) কিন্তু এখন একজন মানুষকে, সে ইতিমধ্যেই যা, তা-ই হওয়ার জন্য সংগ্রাম করতে হবে। এরকম একটা কাজের জন্য কষ্ট করে বা এত স্বার্থ ত্যাগ করে কে তার সময় নষ্ট করবে?... এ কারণেই এটা খুব কঠিন কাজ, প্রকৃতপক্ষে সবচেয়ে কঠিন কাজ।[৪]

এ ছাড়াও বিষয়ীগত হতে হলে মানুষকে সিদ্ধান্ত নিতে হবে, উদ্বেগে ভুগতে হবে, প্যারাডক্সের মুখোমুখি হতে হবে, অঙ্গীকারহীন বিমূর্ত চিন্তার নিরাপত্তা ত্যাগ করে আত্ম-অঙ্গীকারের ঝুঁকি নিতে হবে, তাকে জব ও এ্যাব্রাহামের মতো "ভয় ও কাঁপুনি"র (fear and trembling) মুখোমুখি হতে হবে (পরবর্তী পঞ্চম অধ্যায়ে আমরা এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা করব)। বিষয়ীগত চিন্তার মাধ্যমে অনপেক্ষ নিশ্চয়তাকে পেতে চাইলে এমন একটা অবস্থার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে যেখানে সব নিশ্চয়তা লুপ্ত হয়। এ জন্যই মানুষ বিষয়ীগত হতে চায় না। সে ভয় পায়; ভাবে, সে তার স্বাধীন সত্তা নিয়ে হয়তো ভয়ঙ্কর বিপদে পড়ে যাবে। সে হেগেল বা অন্যান্য বুদ্ধিবাদীর বিশাল পদ্ধতিতে স্বস্তিতে টিকে থাকার নিরাপত্তা চায়, মনে করে, "হেগেল থেকে দূরে সরে গেলে এমন অবস্থা হবে যে কেউ হয়তো তাকে আর একটা চিঠিও লিখবে না।"[৫]

'বিষয়ীগত সত্য' চিন্তা করতে গিয়ে মানুষ অনিশ্চয়তায় ভোগে বা উদ্বেগে আক্রান্ত হয় কেন? এর কারণ মানুষ যখন বিষয়ীগত হয় তখন তার ভাবনার বিষয় হয় আসলে সত্য ও তার নিজের মধ্যে যে-সম্পর্ক আছে সেই সম্পর্ক। নিচের ১নং চিত্র (figure) দিয়ে বিষয়টিকে দেখানো যেতে পারে।

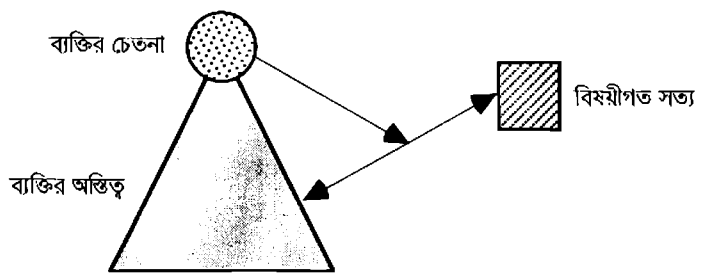

১ নং চিত্র

যদি কোনো একদিন আপনার কাছে কোনো এক বিকেলকে বিষণ্ন মনে হয় তা হলে বুঝতে হবে আপনার চেতনা জুড়ে কেবল বিকেল নয়, আপনিও আছেন এবং আপনার চিন্তা বা উপলব্ধির বিষয় কেবল বিকেল বা কেবল আপনার নিজ-অস্তিত্ব নয়, আপনার চিন্তা বা উপলব্ধির বিষয় হচ্ছে বিকেল ও আপনার অস্তিত্বের ভেতরকার সম্পর্ক। এখানে 'বিকেল' সবার জন্য সত্য, 'বিষয়গত' সত্য। কিন্তু 'বিষণ্ন বিকেল' কেবল আপনার জন্য সত্য, 'বিষয়ীগত' সত্য।

'বিষয়গত সত্য' (objective truth) চিন্তা করতে গিয়ে মানুষ অনিশ্চয়তায় ভোগে না কিংবা উদ্বেগে আক্রান্ত হয় না, তার কারণ এখানে সে নিজে জড়িত নয়। এখানে সে নিজেকে বাদ দিয়ে কেবল বিমূর্ত বিষয় নিয়ে চিন্তা করে।

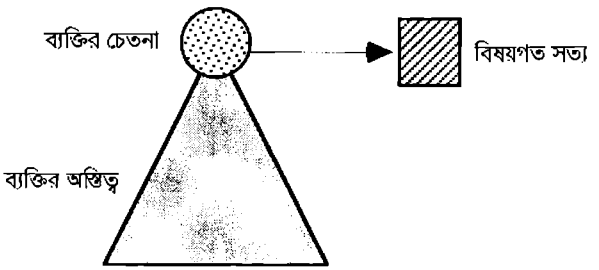

২ নং চিত্র

ধরা যাক, আপনি নাওয়া-খাওয়া ভুলে গণিত বা অন্য কোনো বিষয়ের তাত্ত্বিক দিক নিয়ে গভীর চিন্তায় রত। এমতাবস্থায় ওই চিন্তা থেকে একটু সরে এসে লক্ষ করলে আপনি দেখবেন আপনার ওই চিন্তনক্রিয়ার কোথাও আপনার নিজের অস্তিত্ব নেই, ফলে এটি 'বিষয়ীগত' নয় 'বিষয়গত' সত্য। কিয়ের্কেগার্ডের নিজের ভাষায় বিষয়টি কীভাবে উপস্থাপিত হয়েছে তা লক্ষ করা যাক :

> যখন বিষয়গতভাবে সত্য বিষয়ক প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, তখন সত্য বিষয়ক প্রশ্নটি, যার সঙ্গে চিন্তনকারীর সম্পর্ক আছে, চিন্তনকারীর চিন্তার বিষয়ে পরিণত হয়। এক্ষেত্রে চিন্তার বিষয় কেবল সত্য সম্পর্কিত প্রশ্নটি। কিন্তু চিন্তাকারীর সঙ্গে যে প্রশ্নটির একটি সম্পর্ক আছে, সেই সম্পর্কটি আর চিন্তার বিষয় হয় না। তা হলে যে বিষয়ের সঙ্গে বিষয়ী সম্পর্কিত (অর্থাৎ যে বিষয় নিয়ে বিষয়ী চিন্তা করছে) কেবল সেই বিষয়টি, অর্থাৎ সত্য সম্পর্কিত প্রশ্নটি সত্য বলে প্রতিভাত হলেই বলা যাবে যে বিষয়ী সত্যের নাগাল পেয়েছে। যখন সত্য বিষয়ক প্রশ্নটি বিষয়ীগতভাবে উত্থাপিত হয়, তখন চিন্তনকারীর চিন্তার বিষয় হয়, বিষয়ীগতভাবে, চিন্তনকারীর সঙ্গে উত্থাপিত বিষয়টির ব্যক্তিগত সম্পর্ক। এক্ষেত্রে যে বিষয়টি নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে, সেই বিষয়টি মিথ্যা প্রমাণিত হলেও শুধুমাত্র চিন্তার বিষয়ের সঙ্গে চিন্তনকারীর সম্পর্কের জোরেই বলা যাবে যে চিন্তনকারী সত্যের মধ্যেই অবস্থান করেছে।[৬]

কিয়ের্কেগার্ড খ্রিস্টধর্মের প্রসঙ্গ এনে উপর্যুক্ত বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন অথবা এটাও বলা যেতে পারে, বিষয়গত ও বিষয়ীগত সত্যের উল্লেখ করে তিনি খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কে তাঁর ধারণা ব্যক্ত করার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন, "খ্রিস্টধর্মকে বিষয়গতভাবে গ্রহণ করলে সেটা

প্যাগানবাদ কিংবা চিন্তাহীনতায় পরিণত হবে।"[৭] আরেক জায়গায় লিখেছেন : "খ্রিষ্টধর্ম সব বিষয়গততার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে... এটার যা প্রয়োজন তা হচ্ছে বিষয়ীগততা; কারণ এই ধর্মে সত্য বলে যদি কিছু থাকে তো এখানেই আছে। বিষয়গতভাবে খ্রিষ্টধর্মে কোনো সত্য নেই।"[৮]

খ্রিষ্টান ধর্ম হচ্ছে একটি জীবন যাপন-পদ্ধতি। খ্রিষ্টধর্মের নির্দেশ অনুযায়ী কাজ না করে অর্থাৎ ধর্মপালন না করে, একে একটি চমৎকার চিন্তাধারা হিসেবে বিশ্বজগতের একটি বিমূর্ত ব্যাখ্যা হিসেবে, অথবা কেবল একটি ধর্মাচার হিসেবে গ্রহণ করলে এটাকে প্রায় অর্থহীন করে ফেলা হবে। বিষয়ীগত পদ্ধতি সবসময়ই ধর্মীয় মতবাদ, জীবন ও কাজের মধ্যে সম্পর্ক-সূত্র তৈরি করে; ধর্মীয় মতবাদকে বাস্তবতা প্রদান করার জন্য এই পদ্ধতি আমাদেরকেও অন্তর্ভুক্ত করে। আমরা যা বিশ্বাস করি, আমাদের অবশ্যই তা পালন করার সদিচ্ছা থাকতে হবে, যাতে বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে আমরা এর অর্থ উপলব্ধি করতে পারি।

কর্ম যদি সঠিক প্রবণতার ওপর ভিত্তি করে কৃত হয়, কেবল তা হলেই তা সঠিক ও বিষয়ীগত অন্তর্দৃষ্টি প্রদান করতে পারে। সোকি এই প্রবণতার প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করে লিখেছেন, "বেশির ভাগ মানুষই যখন নিজেদের প্রতি বিষয়ীগত, তখন অন্যদের বিরুদ্ধে বিষয়গত, কখনো কখনো ভয়ঙ্করভাবে বিষয়গত কিন্তু বাস্তবে করণীয় কাজটি ঠিক এর বিপরীত; নিজের প্রতি হতে হবে বিষয়গত ও অন্যদের প্রতি বিষয়ীগত।"[৯] অন্যদের প্রতি কঠোর হওয়া এবং নিজেদের প্রতি ক্ষমাশীল হওয়ার যে প্রবণতা আমাদের আছে তাকে মেনে নেওয়া উচিত নয়, কারণ আমরা তখনই অন্যদেরকে বুঝতে পারব, যখন তাদেরকে আমাদের ভেতর থেকে বোঝার চেষ্টা করব, যখন তাদের অভিজ্ঞতাকে আমাদের নিজেদের করে নেওয়ার চেষ্টা করব। আমরা যখন নিজেদের মুখোমুখি হই, আমাদের একটি বিশেষ নির্লিপ্ততার প্রয়োজন হয় যাতে আমরা আমাদের সেই আত্মসত্তা (self) থেকে পক্ষপাতিত্ব ও সংস্কারকে পৃথক করতে পারি যে আত্মসত্তা সবার মধ্যে বিরাজ করে এবং যার ভেতর কেবল ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়েই প্রবেশ করা যায়। অন্য কথায়, বিষয়গততা ও বিষয়ীগততার এই বৈসাদৃশ্যকে আমাদের সবসময়ই প্রয়োজন হয়। এ সম্পর্কে বাইরের জগতে, যেখানে বিষয়গততা তুলনামূলকভাবে বেশি স্বাভাবিক, আমাদেরকে সচেতন থাকতে হয় এবং অন্তর্গত জগতেও, যেখানে পক্ষপাতদুষ্ট বিষয়ীগততা আমাদের অন্ধ করে দিতে চায়, আমাদেরকে এই বৈসাদৃশ্যের কথা মনে রাখতে হয়। আমাদের কর্মে সক্রিয় হওয়া প্রয়োজন, কেননা কর্মই আমাদের অন্তর্জগৎ ও বহির্জগতের মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করে এবং যদি বিষয়গত ও বিষয়ীগত—দু ধরনের প্রবণতাই সঠিক থাকে তো সেটা আমাদের বোধগম্যতা বাড়ায়। সোকির মতে, কেবল ঈশ্বরই "অনপেক্ষ বিষয়ীগততা"; তাঁর জন্য বহির্জগৎ ও অন্তর্জগৎ একই, আমাদের কাছে যা বিষয়গত ও অপরিচিত বলে মনে হয়, তিনি তা ভেতর থেকেই পুরোপুরি জানতে পারেন। আমাদেরকে বিষয়ীগত পদ্ধতির জন্য বিষয়গততাকে ব্যবহার করতে হয়।

আমরা যদি 'যুগপৎভাবে অনপেক্ষ সমাপ্তির সঙ্গে একটি অনপেক্ষ সম্পর্ক এবং আপেক্ষিক সমাপ্তিসমূহের সঙ্গে আপেক্ষিক সম্পর্ক বজায় রাখি' তা হলে সোকি যাকে 'সর্বোচ্চ অর্জন' বলেন তা অর্জন করতে পারব। কিন্তু এটা খুব সহজ বিষয় নয়, এটাকে অর্জন করতে হলে রীতিমতো সাধনার প্রয়োজন। কারণ আমাদের স্বাভাবিক প্রবণতা হচ্ছে, যদি কোনো বিষয় আমাদের দৈনন্দিন ব্যবহারিক জীবনকে প্রভাবিত না করে তা হলে তা যত গুরুত্বপূর্ণই হোক না কেন আমরা তা এড়িয়ে যাই বা ভুলে যাই। যেমন আমার যদি

অনেক টাকার ক্ষতি হয় বা আমি যদি আমার জন্য বিব্রতকর ও সামাজিকভাবে অগ্রহণযোগ্য কিছু করে ফেলি তা হলে তার জন্য আমি যতটা চিন্তিত হই, আমা-কৃত কোনো গভীর পাপ, যদি তা গোপন থাকে বা সমাজ যদি তা মেনে নেয় তা হলে তা নিয়ে আমি অতটা চিন্তা করি না। আমরা আমাদের হৃদয়ের অলসতা ক্ষমা করে দিই কিন্তু যে ভুল বাস্তব জীবনে ক্ষতির কারণ হয় তাকে অত সহজে ক্ষমা করতে পারি না। কিন্তু আমরা একবার যখন সোকির সেই নির্লিপ্ততা নিয়ে আপেক্ষিক সমাপ্তিগুলোর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করতে পারি এবং অনপেক্ষর প্রতি দায়বদ্ধ হই, তখন আমাদের দর্শন সঠিক পথে এগিয়ে চলে।

তা হলে সোকি বিষয়ীগত হতে গিয়ে বিষয়গততাকে একেবারে বাদ দিচ্ছেন না। তবে এক্ষেত্রে সোকি ও তাঁর অনুসারীদের সঙ্গে অন্য দার্শনিকদের যে পার্থক্য আছে তা আমাদের খেয়াল রাখতে হবে। অন-অস্তিত্ববাদী দার্শনিকরা বিষয় থেকে শুরু করে তারপর এমন এক ব্যক্তির কথা ভাবেন যে একটি বিমূর্ত সত্তা, একজন বিমূর্ত চিন্তাকারী এবং তারপর তাঁরা 'বিষয়গত জ্ঞান' অর্জন করার জন্য আবার বিষয়ে ফিরে যান। সোকি ব্যক্তি থেকে শুরু করেন, তারপর বিষয়কে অন্তর্ভুক্ত করেন যাতে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা অর্জন করা যায় ও তা শুধরে নেওয়া যায় এবং তারপর সঠিক বিষয়ীগততাকে অর্জন করার জন্য আবার ব্যক্তির কাছে ফিরে যান। তিনি আমাদের অন্তর্গত অভিজ্ঞতার দিকে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করেন; তাঁর লক্ষ্য হচ্ছে আমাদের অন্তঃপ্রকৃতি।

এই দুটো পদ্ধতির ভেতর আর একটি বিষয়ে বৈপরীত্য আছে। তারা যে নির্ভরযোগ্যতা অর্জন করে তা একরকম নয়, তাদের ভিত্তি দু রকম নিশ্চয়তা।

বিষয়গত পদ্ধতির ফলাফলগুলোকে পরীক্ষা করা যায়, প্রমাণ করা যায় এবং একবার প্রমাণিত হওয়ার পর সবাই এটাকে নিশ্চয়তার সঙ্গে গ্রহণ করে, কারণ অধিকতর অনুসন্ধান ছাড়াই তাদেরকে গ্রহণযোগ্য মনে হয়। তবুও তারা কখনো চূড়ান্ত নয়। যদিও বাস্তব সত্য পরিবর্তন হয় না, তাদের ব্যাখ্যা পাল্টে যায় এবং নিরন্তর নতুন নতুন সত্য আবিষ্কারের ফলে বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ঘষামাজা হয় কিংবা কখনো কখনো তা পুরোপুরি পাল্টে যায়।* তবে এক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্যতা খুবই প্রয়োজনীয়, নির্ভরযোগ্যতার জন্যই বিজ্ঞানের কারিগরী প্রয়োগ সম্ভবপর হয়। কিন্তু একে কখনোই অনপেক্ষভাবে নিশ্চিত বলে মনে করা উচিত নয়, কারণ তাতে নতুন অগ্রগতি ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

আমরা যে অবিরাম নতুন করে পুরনো অভিজ্ঞতা লাভ করছি, এর ওপরই বিষয়ীগত পদ্ধতি নির্ভর করে; শুধু একবার সঠিক মনে হলেই এর ফলাফলগুলোকে গ্রহণ করা যায় না, কারণ তাদেরকে সবসময়ই আমাদের অভিজ্ঞতায় রূপান্তর করে যাচাই করে নিতে হয়। যেহেতু এখানে ব্যক্তিগত অংশগ্রহণের বিষয়টি জড়িত, সেহেতু একদিকে যেমন অনিশ্চয়তার বিষয়টি আসে তেমনি ব্যক্তিগতভাবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টিও অবধারিত হয়ে পড়ে। এ কারণেই এই পদ্ধতির ব্যবহার সবসময়ই সমস্যাকীর্ণ ও বিপদসঙ্কুল; এর ফলাফলকে সত্য বলে গ্রহণ করা বেশ কঠিন। তবুও একবার নিশ্চয়তা অর্জিত হয় এবং এই নিশ্চয়তা হচ্ছে অনপেক্ষ (absolute)।

যেমন আমরা যখন ভালোত্বের পুরো অভিজ্ঞতা লাভ করি এবং তখন যদি আমরা আমাদের অভিজ্ঞতার প্রতি সুবিচার করি, আমরা আর সন্দেহ করতে পারি না যে আমরা এমন এক বাস্তবতাকে স্পর্শ করেছি যাকে নিঃশর্তে গ্রহণ করা ছাড়া উপায় নেই। অতএব

---

* যেমন কোয়ান্টাম পদার্থবিদরা আর আগের মতো কার্যকারণসূত্রকে মেনে নিতে পারছেন না।

Ten Commandments কিংবা Sermon on the Mount-এর মতো বিষয়ীগত পদ্ধতির এমন এক সুস্থিতি আছে যা বিষয়গত পদ্ধতিতে নেই। এই ফলাফলগুলো চূড়ান্ত তবে সেগুলোকে কখনো পুরোপুরিভাবে অন্যদের জানানো যাবে না। তাদেরকে যদি আমাদের দৃঢ় প্রত্যয়ের অংশ করতে চাই কিংবা তাদেরকে যদি আমাদের জীবনের অংশে পরিণত করতে চাই তবে তাদেরকে বারবার আমাদের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে পেতে হবে। তাই সবসময় একটা ঝুঁকি থেকে যায়; কারণ এক্ষেত্রে আমরা যদি ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত নেই তো শুধরে দেওয়ার মতো কাউকে পাব না। কিন্তু এই ঝুঁকিটা নেওয়া উচিত, কারণ বিজ্ঞান যখন আমাদের বহির্জগৎকে পুরোপুরি পাল্টে দিচ্ছে তখন কেবলমাত্র বিষয়ীগত পদ্ধতির সম্ভাব্য সদর্থক ফলাফলগুলো আমাদের অন্তর্গত ও ব্যক্তিগত উন্নতিকে নিশ্চিত করতে পারে।

এ কারণেই সোকি বলতে ভোলেন না— "বিষয়ীগত সত্যকে কোনোভাবেই হেলা করা যাবে না। আসলে এটাই সত্য। সত্য হচ্ছে বিষয়ীগততা।"

কিয়ের্কেগার্ডের এইসব বাক্য শুধু কথার কথা নয়। তিনি এই সবই মনে-প্রাণে বিশ্বাস করতেন। শুধু বিশ্বাস করতেন বললে ভুল হবে, আমৃত্যু যে দর্শন তিনি উপলব্ধি করেছেন, সারা জীবন ধরে যে দার্শনিক মতবাদ তিনি লিপিবদ্ধ করেছেন, সবই তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতাসঞ্জাত। তিনি কোনো যুক্তি-জাল বিস্তার করেন নি বা বুদ্ধি দিয়ে কিছু প্রমাণ করতে চান নি। তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনা, সুখ-দুঃখ, উদ্যম-হতাশা, হরিষ-বিষাদ, প্রেম-বিরহ, উদ্বেগ-সংশয়— যাবতীয় অনুভূতির নির্যাস থেকেই তৈরি হয়েছে তাঁর দর্শন। ফলে কিয়ের্কেগার্ডের দর্শন-আলোচনায় অবধারিতভাবেই তাঁর ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ চলে আসে। আসুন আমরা আবার তাঁর ব্যক্তিগত জীবনে ফিরে যাই।

তথ্যসূত্র :

১. Reardon, Bernard M. G., 1966. *Religious Thought in The Nineteenth Century,* Cambridge University Press, p. 173

২. Kierkegaard, Søren, 1941, *Concluding Unscientific Postscript,* trans. D. Swenson and W. Lowrie, Princenton, Princeton University Press, p. 183, উদ্ধৃত, Solomon, Robert C., 1989, *From Hegel To Existentialism,* p. 73.

৩. Ibid., উদ্ধৃত, Roubiczek, Paul, 1966, *Existentialism for and against,* Cambridge, Cambridge University Press, p. 102

৪. Ibid., উদ্ধৃত, Ibid.

৫, Ibid., p. 317, উদ্ধৃত, Blackham, H. J., 1994, *Six Existentialist Thinkers,* London, Routledge, p. 14.

৬. Ibid., উদ্ধৃত, Kaufmann, Walter (ed.), 1975, *Existentialism From Dostoevsky To Sartre,* A Meridian Book, p. 115

৭. Ibid., উদ্ধৃত, *Existentialism for and against,* p. 103

৮. Ibid., p. 116, উদ্ধৃত, Hartshorne, M. Holmes, 1990, *Kierkegaard Godly Deceiver,* New York, Columbia University Press, p. 38

৯. *The Journals,* 1938, Oxford, p. 153, উদ্ধৃত, *Existentialism for and against,* p. 103

রেগিন ওলসেন

Infandum me jubes, Regina, renovare dolorem*

—Kierkegaard

আমরা দেখেছি যে শৈশব ও কৈশোরে কিয়ের্কেগার্ড পড়ুয়া ও বুদ্ধিমান ছিলেন বটে কিন্তু সবসময়ই মনমরা হয়ে থাকতেন। উপরন্তু ঘরের চার দেওয়ালের মধ্যে যাও একটু সহজ বোধ করতেন ঘরের বাইরে বন্ধুদের সঙ্গে কখনোই স্বস্তি অনুভব করেন নি। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর জীবনে এক ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে এল। বিশ্ববিদ্যালয়—যেখানে ক্লাসের কড়াকড়ি নেই, যেখানে সবসময় খবরদারি করার মতো মাথার ওপর কেউ থাকে না, যেখানে একজন যুবক তার যা খুশি প্রায় তা-ই করতে পারে, যেখানকার অবারিত অফুরন্ত জ্ঞানভাণ্ডার থেকে যত খুশি আহরণ করা যায়—কিয়ের্কেগার্ডের জন্য আশীর্বাদ হয়ে এল। তাঁর এতদিনকার অবরুদ্ধ কামনা-বাসনা যেন সত্যিই এবার পাখা মেলল। যে এতদিন জানত না স্বাধীনতা কী জিনিস, সে এবার তার তলানিটুকু পর্যন্ত আকণ্ঠ পান করতে চাইল। প্রথম চার বছর তিনি শিখলেন কী করে জাগতিক জীবন যাপন করতে হয়। যে পিতাকে আজীবন জুজুর মতো ভয় করে এসেছেন, তাঁর সঙ্গে সম্পর্ক স্বাভাবিক হয়ে এল। সঙ্গীত, নাটক ও সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট হলেন। যদিও নিজের বিষয় ছিল ধর্মতত্ত্ব কিন্তু আধুনিক দর্শনের জটিল দিকগুলো বোঝার চেষ্টা করলেন। মোটের ওপর তিনি একজন পরিপক্ব মানুষ হয়ে উঠতে লাগলেন। বিশ্ববিদ্যালয় জীবনের প্রথম দিকে তিনি শিল্প ও নন্দনতত্ত্বের প্রতি তীব্রভাবে আকৃষ্ট হন। প্রথম বর্ষে তিনি ইওরোপীয় সঙ্গীতের অত্যন্ত আগ্রহী শ্রোতা ছিলেন, *Either/Or*-এর প্রথম ভল্যুমে তখনকার অনুভূতি বিবৃত আছে। এ ছাড়াও তিনি থিয়েটারের একজন নিয়মিত দর্শকে পরিণত হয়েছিলেন। প্রায় সমান আগ্রহ নিয়ে সাহিত্যে, বিশেষ করে জার্মান সাহিত্যে মনোনিবেশ করেছেন, যা খুশি তাই পড়েছেন, পছন্দ হলে যে কোনো

---

* কিয়ের্কেগার্ড *'ইনিড'*-এর (*Aeneid* 11, 3)—Thou biddest me, O Queen, renew an unspeakable grief—শব্দগুলোকে একটু পরিবর্তন করে উদ্ধৃত করেছেন। কিয়ের্কেগার্ডের এই উদ্ধৃতি সম্পর্কে Louis Mackey-র মন্তব্য হচ্ছে : "...these words which Kierkegaard set as an epigram over the account of his unhappy betrothal to Regina Olsen might stand for an epitaph over the man and his work."[১]

বক্তৃতা শুনেছেন। ছাত্রদের সঙ্গে বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে অংশ নিয়েছেন—বিভিন্ন সেমিনারে লেকচার দিতেন, বন্ধুদের সঙ্গে তর্কে মেতে উঠতেন, ক্যাফেটারিয়াতে আড্ডা দিতেন এবং খিদে পেলেই কেবল বাড়ি ফিরতেন।

এই সময় পিটার উইলহেনস লুন নামের এক নামকরা বিজ্ঞানীর (প্রকৃতিবিদ) সঙ্গে কিয়ের্কেগার্ডের পরিচয় হয়। এখানে বিষয়টি এই কারণে উল্লেখ্য যে এই বিজ্ঞানীর কাছে লেখা চিঠিতে তিনি বিজ্ঞান সম্পর্কে তাঁর ধারণা স্পষ্ট ব্যক্ত করেছেন। তিনি লিখেছেন, বস্তুজগতের রহস্য নিয়ে তাঁর কোনো আগ্রহ নেই, তিনি বুঝতে চান জীবনকে। ফলে প্রণালীবদ্ধ বিজ্ঞান অধ্যয়নে তিনি কখনো আকৃষ্ট হন নি।

জীবনরহস্য নিয়ে তাঁর ঐকান্তিক আগ্রহের জন্যই হয়তো তিনি লেখাকে পেশা হিসেবে বেছে নেওয়ার কথা ভাবলেন। প্রথমে ঠিক করলেন তিনি কবি হবেন। এ কারণে খুব মনোযোগ দিয়ে *Faust, Don Juan* ও *Wandering Jew* পড়লেন। তাঁর বিখ্যাত বই *Either/Or*-এ প্রথম দুটি বইয়ের প্রভাব সুস্পষ্ট।

এই সময়ে তিনি রবিন হুডের অনুরক্ত হয়ে পড়েন। এই master thief-এর গুণাবলি সম্পর্কে তাঁর ধারণা প্রমাণ করে যে তিনি তখন একটা complex-এ ভুগছিলেন। এই বিষয়ে তিনি তাঁর জার্নালে লিখেছেন :

> আমাদেরকে অবশ্যই সতর্কতার সঙ্গে স্মরণ করতে হবে যে এটা কেবল নীতিহীনতা, চৌর্যবৃত্তি বা এ জাতীয় কিছু নয়। বরং master thief-কে বরাবরই সুশীল, প্রেমময় এবং দয়ালু হিসেবে চিত্রিত করা হয়েছে, তাঁর আচার-আচরণে বিশেষ বৈশিষ্ট্য আছে এবং উপরন্তু তার মধ্যে আছে অসাধারণ ধূর্ততা ও বিচক্ষণতা। সে কেবল চুরির জন্য চুরি করে না।[২]...

উপর্যুক্ত উদ্ধৃতাংশে নিহিত কিছু বিষয় পরবর্তীকালে আরো স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। যেমন প্রথমত সোকির প্রতিষ্ঠানবিরোধী মনোভাব, দ্বিতীয়ত তাঁর অসাধারণ হওয়ার আইডিয়া এবং তৃতীয়ত বিপথে-যাওয়া একজন মানুষের নৈতিকতা যে অনেক উন্নত হতে পারে তার স্বীকৃতি। পরে আমরা দেখব যে প্রতিষ্ঠানভিত্তিক খ্রিষ্টধর্মকে তিনি একটি বিকৃত ধর্ম বলে উল্লেখ করেছেন, নিজেকে একজন অসাধারণ মানুষ বলে মনে করতেন এবং কখনোই প্রথাগত দার্শনিক, ধর্মীয় ও পারিবারিক জীবনকে বেছে নেন নি; তাঁর কাছে প্রচলিত নৈতিকতা খুব গুরুত্বপূর্ণ ছিল না। তিনি মনে করতেন ধর্মের জন্য ঈশ্বরের নৈকট্য লাভের প্রত্যাশায় একজন মানুষ অনায়াসে প্রচলিত নৈতিকতাকে অবজ্ঞা করে 'বিপথে' যেতে পারে। এক্ষেত্রে তাঁর সামনে সবচেয়ে বড় দৃষ্টান্ত হচ্ছেন বাইবেলের এ্যাব্রাহাম যিনি ঈশ্বরের আদেশ পালন করার জন্য জাগতিক নৈতিকতাকে তুচ্ছ করে নিজ সন্তানকে হত্যা করতে গিয়েছিলেন।

প্রায় এই সময়েই কিয়ের্কেগার্ডদের পরিবারে বেশ কিছু দুঃখজনক ঘটনা ঘটে। ইতিমধ্যেই ১৮১৯ সালে মাত্র ১২ বছর বয়সে ভাই সোরেন মিকেইল মারা গেছে। ১৮২২ সালে সবার বড় বোন ম্যারেন ক্রিস্টিন মারা গেছে ২৫ বছর বয়সে। তারপর ১৮৩২ সালে ঠিক এর পরের বোন নিকোলোইন যখন মারা যায় তখন তার বয়স ৩৩। পরের বছরই অর্থাৎ ১৮৩৩ সালে নিয়েলস এ্যানড্রিয়েস আমেরিকায় গিয়ে মারা যায়। আবার বছর ঘুরতেই ১৮৩৪ সালের জুলাই মাসে মারা যান মা এবং ওই একই বছরের ডিসেম্বর মাসে বোন প্যাট্রি ৩৪ বছর বয়সে মারা যায়[৩]। উপর্যুপরি ঘটে যাওয়া মর্মান্তিক এই মৃত্যুগুলো কিয়ের্কেগার্ডকে একেবারে গুঁড়িয়ে দিয়ে যায়। এক অদ্ভুত কুসংস্কারে আচ্ছন্ন হয়ে পড়েন তিনি। যেহেতু কোনো ভাইবোন ৩৪ বছরের বেশি বাঁচে নি, তাই কিয়ের্কেগার্ড ও তাঁর অন্য ভাইরা ভাবতে

শুরু করেন যে তাদের আয়ু কোনোভাবেই ৩৪ বছর অতিক্রম করবে না, এটা নিয়তিনির্দিষ্ট। ফলে বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম কয়বছরের সেই উচ্ছল, জীবন্ত কিয়ের্কেগার্ড আবার মনমরা হয়ে পড়লেন। বিষণ্ণতা পূর্বের মতোই গ্রাস করে নিল তাঁকে। ইতিমধ্যে পিতার সেই গোপন পাপ আবিষ্কার করে ফেলেন তিনি এবং আরো দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করতে থাকেন যে তাঁর পিতৃ-কৃত পাপের শাস্তি হিসেবে তাঁর ভাইবোনদেরকে কম বয়সে মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে এবং বাকি সবাইকেই খুব শিগগির এই পৃথিবী ছেড়ে যেতে হবে।

২২ থেকে ২৫ বছর বয়সের মধ্যেই কিয়ের্কেগার্ড সেই গোপন পাপটি আবিষ্কার করেন। এই বিষয়টি জানার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর মনে হল যেন পাল্টে গেছে সবকিছু। প্রতিটি বিষয়কে মনে হল পূর্বনির্ধারিত, যেন ঈশ্বরের ইচ্ছানুসারে একের পর এক ঘটনা ঘটে চলেছে। তিনি তাঁর দুশ্চিন্তাগ্রস্ত পিতার কথা ভাবলেন, সর্বদা তাঁদের বাড়িতে যে বিষণ্ণতার কালো ছায়া ঘিরে থাকত তার কথা ভাবলেন, ভাইদের এবং তাঁর নিজের বিষাদগ্রস্ততার কথা চিন্তা করলেন—সব মিলিয়ে তাঁর সিদ্ধান্ত নিতে অসুবিধে হল না যে এই সবকিছুর মূলে আছে তাঁর পিতার সেই গোপন পাপ এবং এই পাপের জন্যই তাঁর পিতাকে নিজ সন্তানদের শব বহন করতে হয়েছে এবং হবে। তিনি এখন বুঝতে পারলেন যে তাঁর পিতার এই অতি-ধার্মিকতা আসলে বিশুদ্ধ ঈশ্বরভক্তি নয়, সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে অমান্য করার কারণে যে ভীতি তাঁকে আষ্টেপৃষ্ঠে আঁকড়ে ধরেছে সেই ভীতি থেকে নিজেকে রক্ষা করার জন্যই তিনি ধর্মের আশ্রয় নিয়েছেন।

আমরা আগে দেখেছি, সোকির কাছে পিতার এই গোপন পাপ উন্মোচন ছিল এক ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পবিশেষ। এই ভয়ঙ্কর ভূমিকম্পের পর কিয়ের্কেগার্ডের জীবনে বেশ কিছু পরিবর্তন এল, তাঁর অন্তর্জগতে প্রবল প্রতাপান্বিত পিতার আসন টলে উঠল। মানসিকভাবে একেবারে ভেঙে পড়লেন তিনি।

সব মিলিয়ে অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছিল যে এ সময়ে তিনি এমনকি আত্মহত্যার কথাও চিন্তা করেছেন। নিজ-সত্তা থেকে পালিয়ে বাঁচার জন্য, নিজের ক্ষতকে ভুলে থাকার জন্য, বন্ধু, সুহৃদ, কবি ও কুঁড়েদের সাহচর্যকে আঁকড়ে ধরেছেন। এমনকি প্লেবয়-জীবন যাপন করেও দেখেছেন : সন্ধ্যায় আকণ্ঠ মদ্যপান, তারপর প্রমোদবালাদের রঙিন সাহচর্যে সেই নেশাকে আরো সান্দ্র করে রাত পুইয়ে ঘরে ফিরে আরেকটি রঙিন দিন শুরু করার প্রস্তুতি নিতেন। তিনি ধরেই নিয়েছিলেন তাঁর আয়ু ৩৪ বছর। তিনি কোনোভাবেই যেহেতু এই আয়ুকে সামান্যতমও বাড়াতে পারবেন না, তাই প্রায়ই ভাবতেন এ জীবন রেখে আর লাভ কি! আবার পরক্ষণেই মনে হত, না, যতদিন বাঁচবেন জীবনকে আশ্লেষে ভোগ করেই বাঁচবেন। অন্যদিকে যখনই একাকী নিজের মুখোমুখি পড়ে যেতেন, মনে হত এ জীবন বৃথা, কারণ মায়াবী 'শান্তি' চিরকাল ছলনাই করে যাবে, কখনো ধরা দেবে না। বন্ধুবৃত্তে নিজেকে বাক্‌চাতুর্যময় উদ্দাম এক বেহিসেবি মানুষ বলে প্রমাণিত করতে পারলেও নিজের বিমর্ষতাকে এড়িয়ে যেতে পারেন নি তিনি।* তিনি, তাঁর বয়স যখন তেইশ, জার্নালে লিখেছেন :

---

* আমরা 'জীবনের তিনটি স্তর' অধ্যায়ে দেখব যে সোকি এ ধরনের জীবনকে 'aesthetic' (ভোগী) জীবন আখ্যা দিয়েছেন। এর সামান্য কিছুদিন পরই তাঁর জীবনে আবার এক ব্যাপক পরিবর্তন পরিলক্ষিত হয়। তিনি নৈতিকতাকে আঁকড়ে ধরেন অর্থাৎ সেই ধরনের জীবন যাপন করা শুরু করেন যাকে পরে তিনি 'নৈতিক জীবন' বলেছেন।

এইমাত্র এমন একটি পার্টি থেকে এলাম যার মধ্যমণি ছিলাম আমি; আমার মুখ থেকে চমৎকার বুদ্ধিদীপ্ত সব কথা অনর্গল যেন স্রোতের মতো বেরিয়ে আসছিল, সবাই তা উপভোগ করেছে এবং আমার খুব প্রশংসা করেছে, কিন্তু আমি চলে এলাম (এই ড্যাশটির দৈর্ঘ্য হওয়া উচিত পৃথিবীর কক্ষপথের সমান)——————————————————

এবং ইচ্ছে হল নিজেকে গুলি করে মেরে ফেলি।[৪]

আমরা জানি সোকি নিজের ও তাঁর ভাইবোনদের পরিণতি সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিত ছিলেন। তাঁর কোনো সন্দেহ ছিল না যে তাঁদের পিতা মিকেইল পিডারসেন তাঁর ভয়ঙ্কর পাপের শাস্তি হিসেবে একের পর এক সন্তানদের হারাবেন, অর্থাৎ তাঁদের ভাইবোনদের সবাইকেই খুব শিগগির এই পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হবে। তাঁরা কেউই স্বাভাবিক জীবন যাপন করতে পারবেন না কারণ তাঁরা সবাই উৎসর্গের জন্য নির্দিষ্ট হয়ে আছেন।

এই পর্যায়ে সোকির সঙ্গে হ্যামলেটের তুলনা করা যায়। তিনি তাঁর বাবার গোপন কথা জানতেন আর হ্যামলেট জানতেন তাঁর মা সম্পর্কে। দু'জনই তাঁদের প্রণয়াচরণে অস্বাভাবিক। তাঁদের মধ্যে পার্থক্যটা হচ্ছে এই, সোকি নিজেকে উৎসর্গের জন্য নির্দিষ্ট বলে ভাবতেন কিন্তু হ্যামলেট তা ভাবেন নি।

সোকি Thomas Skat Rordam বলে একজন ধর্মযাজকের বাসায় যাতায়াত করতেন। এই যাজকের মেয়ে Bolette-কে তাঁর বেশ ভালোই লাগত। যদিও মেয়েটির সঙ্গে ইতিমধ্যেই ধর্মতত্ত্বের এক ছাত্রের বাগদান সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু সোকির দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে অন্যের বাগদত্তা হওয়া সত্ত্বেও তিনি মেয়েটির হৃদয় জয় করতে পারবেন। যাই হোক, ঘটনা এদিকে আর খুব বেশি গড়ায় নি কারণ কিছুদিন পরই আর একটি মেয়ে তাঁর নজর কেড়ে নেয়, প্রথম দর্শনেই প্রেম। মেয়েটির নাম রেগিন ওলসেন (Regine Olsen), বেশ ক্ষমতাবান সরকারি কর্মচারীর মেয়ে। রেগিন-র বয়স তখন ১৪ আর সোকির ২৪। এরপর বই ধার দেওয়া বা এরকম অন্য অনেক অজুহাতে সোকি ঘন ঘন রেগিন-র বাসায় যাতায়াত শুরু করেন।[৫]

১৮৩৮-এর মাঝামাঝি থেকে ১৮৪০-এর অগাষ্ট পর্যন্ত কিয়ের্কেগার্ড ওলসেনদের পরিবারে নিয়মিত যাতায়াত করলেন। অবশেষে ১৮৪০ সালের ৮ সেপ্টেম্বর তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে আজ তাঁর সমস্ত আবেগ উজাড় করে দেবেন প্রিয়তমার পায়ে। বাড়ির বাইরে রাস্তাতেই দেখা হয়ে গেল রেগিন-র সঙ্গে, জানা গেল বাড়িতে কেউ নেই। প্রণয়িনীর আমন্ত্রণে গৃহে প্রবেশ করলেন। রেগিন পিয়ানোর সামনে বসে বাজাতে যাবেন, এমন সময় সোকি আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠলেন, "কী হবে সঙ্গীত শুনে! আমি তো কেবল তোমাকে চাই এবং গত দু বছর ধরে শুধু তোমাকেই চাচ্ছি।" ওখান থেকে ওইদিনই সরাসরি রেগিন-র বাবার অফিসে চলে গেলেন, তাঁর কন্যার পাণি প্রার্থনা করলেন। রেগিন-র বাবার কোনো আপত্তি ছিল না, তিনি দু দিনের মধ্যে তাঁর বাসায় সোরেনকে দেখা করতে বললেন। কিন্তু ঠিক এর পরপরই শুরু হল কিয়ের্কেগার্ডের অস্থিরতা। সংশয়ের দোলাচলে দুলতে লাগলেন তিনি, তাঁদের সম্পর্কের এপিঠ-ওপিঠ গভীরভাবে খতিয়ে দেখলেন। মাঝে মাঝে মনে হতে লাগল যেন ভয়ঙ্কর বিপদে পড়তে যাচ্ছেন তিনি, হয়তো এই নিষ্পাপ বালিকাটিসহ "সত্তর হাজার ফ্যাদম পানির নিচে" চলে যাবেন। আবার কখনো মনে হল, না, রেগিনকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত সর্বতোভাবেই সঠিক, ওঁর সঙ্গে বিয়ে না হলেই বরং ব্যর্থ হয়ে যাবে জীবন-যৌবন। এরকম দোটানায় ক্ষতবিক্ষত হতে হতে এক সপ্তাহের মধ্যেই ক্লান্ত বিধ্বস্ত হয়ে পড়লেন।

হয়তো এই সংশয়াকীর্ণ অবস্থা থেকে মুক্ত হওয়ার জন্য তিনি ওলসেনদের সঙ্গে ভালোভাবে মিশতে শুরু করলেন। তাঁদের দুই পরিবারের মধ্যে একটা সুন্দর সম্পর্ক তৈরি হল। কিন্তু কিয়ের্কেগার্ডের অস্থিরতা কিছুতেই দূর হল না। রেগিন-র সঙ্গে থাকলে চমৎকার থাকেন, কিন্তু বাড়ি ফিরলেই আবার সেই কী-যেন একটা ভয় ও উদ্বেগ চেপে ধরে তাঁকে। হয়তো মনের ভেতর লুকিয়ে থাকা নিজের অসুখী জীবন ও স্বল্প আয়ু সম্পর্কে বদ্ধমূল ধারণা মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে, কিছুতেই স্বস্তি পান না তিনি।

কিয়ের্কেগার্ড হয়তো ভেবেছিলেন যে তাঁদের অভিশপ্ত পরিবারে এসে নিষ্পাপ রেগিন-র জীবনটা নষ্ট হয়ে যাবে। কিংবা হয়তো এই মনে করে ভয় পাচ্ছিলেন যে তাঁর নৈতিক পদস্খলনের কথা জানাজানি হয়ে গেলে রেগিন তাঁকে ক্ষমা করবে না (তবে কিয়ের্কেগার্ডের প্রতি রেগিন-র যে গভীর ভালবাসার প্রমাণ পাওয়া যায় তাতে এ ধরনের আশঙ্কাকে অমূলক মনে হয়)। কিয়ের্কেগার্ড হয়তো তাঁর পেশা নিয়েও চিন্তিত ছিলেন; তখন পর্যন্ত বেকার ছিলেন এবং তখন পর্যন্ত চাকরি পাওয়ার কোনো সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছিল না।

যাই হোক, কিছুদিনের মধ্যে তাঁদের সম্পর্কটা স্বাভাবিক হয়। তাঁরা পরস্পরের আরো ঘনিষ্ঠ হন। প্রায়ই এরকম হত যে কিয়ের্কেগার্ড রেগিন-র পাশে বসে কাঁদছেন, আর রেগিন যথাসাধ্য তাঁকে প্রশমিত করার চেষ্টা করছেন। কিয়ের্কেগার্ডের এই দুঃখভার লাঘব করার জন্য (তবে রেগিন-র পক্ষে কিয়ের্কেগার্ডের দুঃখের প্রকৃতি উপলব্ধি করা প্রায় অসম্ভব ছিল) রেগিন তাঁর কাছে ধর্মতত্ত্বের জটিল বিষয়গুলো বুঝে নিতে চাইলেন। এই সময়ের খুব সুন্দর বর্ণনা আছে কিয়ের্কেগার্ডের লেখায়,

> সে ছিল পাখির মতো হালকা। আমি তাকে উঁচু থেকে আরো উঁচুতে উড়তে দিতাম। আমি আমার হাত বাড়িয়ে দিতাম, সে এসে বসত, ডানা ঝাপটাত। আর আমার দিকে তাকিয়ে বলত, 'অপূর্ব'। সে ভুলে গিয়েছিল, আসলে সে জানতই না যে আমিই তাকে হালকা করে তুলেছিলাম। আমিই তাকে চিন্তার দৃঢ়তা প্রদান করেছিলাম। আমার প্রতি তার বিশ্বাসের কারণেই সে জলের ওপর দিয়ে হেঁটে যেতে পারত। এবং আমি তাকে পূজার অর্ঘ্য দিতাম। সে তা গ্রহণ করত।[৬]

এই রকমই মধুর সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল ওঁদের মধ্যে। রেগিন কিয়ের্কেগার্ডের অসুখী মনের কথা জানতেন, মাঝে মাঝেই তাঁর চিন্তাগ্রস্ত হয়ে যাওয়ার অভ্যাসটার কথাও তাঁর অজানা ছিল না। এসব অনুভূতি ভাগাভাগি করে নেওয়ার অঙ্গীকার নিয়েই তিনি কিয়ের্কেগার্ডকে ভালবেসেছিলেন এবং কিয়ের্কেগার্ড সংশয়াকুল অবস্থাতেও আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলেন যাতে সম্পর্কটা টিকে থাকে।

সম্ভবত চিন্তাচ্ছন্নতা কাটিয়ে ওঠার জন্য এবং বিবাহিত জীবনের দায়-দায়িত্বের বিষয়টা ভেবে কিয়ের্কেগার্ড হঠাৎ করেই একেবারে শেষ মুহূর্তে 'Pastoral Seminarium'-এ গিয়ে নিজের নাম রেজিস্ট্রি করলেন। কারণ এখানকার ব্যবহারিক প্রশিক্ষণ সমাপ্ত হলে যাজকের চাকরি পেতে সুবিধে হয়। সেখানে তাঁর প্রথম sermon হচ্ছে, "To me to live is Christ, to die is gain"।[৭] এখানে তিনি বললেন, যে মানুষের কাছে শাশ্বত ও অবগুণ্ঠিত (hidden) জীবন উন্মোচিত হয়েছে, তার কাছে 'মৃত্যু'ই একমাত্র লাভ। আর যার কাছে তা হয় নি, যে ভোগী-জীবন যাপন করে, যে জাগতিক জীবনের প্রেমে আচ্ছন্ন, মৃত্যু তার কাছে ভয়ঙ্কর। এখানে কিয়ের্কেগার্ডের পরস্পরবিরোধী মনোভাবের বিষয়টা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি নিজে Seminarium-এ ঢুকেছিলেন নিতান্ত জীবিকার তাগিদে আবার বলছেন মৃত্যুই একমাত্র 'লাভ'। তিনি দুই নৌকায় পা দিয়ে চলছিলেন। নৌকার রূপক ব্যবহার না করে এভাবে

বললে ভালো হয়— তিনি এক পা রেখেছিলেন ইহলৌকিকতায় আর এক পা কবরে।

অন্যদিকে তিনি 'On the Concept of Irony with Constant reference to Socrates' শিরোনামের পোস্টগ্র্যাজুয়েট ডিসার্টেশন নিয়ে কাজ করছিলেন।[৮] তাঁর আশা ছিল যে ওটা শেষ হলে তিনি নৈতিক দর্শনের অধ্যাপকের পদ লাভ করবেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত তিনি চাকরিটি পান নি। তাঁর বদলে তাঁরই বন্ধু স্থানীয় Rasmus Nielsen* ওই পদে অধিষ্ঠিত হন। এই ঘটনায় খুব মুষড়ে পড়েন কিয়ের্কেগার্ড। তবে এর পেছনে ঈশ্বরের হাত আছ মনে করে নিজেকে শান্ত রাখার চেষ্টা করেন।

এইসব দ্বন্দ্বে ও অন্তর্দ্বন্দ্বে ভুগতে ভুগতে এক সময় ১৮৪১ সালের ১১ অগাস্ট তিনি রেগিন-র কাছে এনগেজমেণ্ট রিং-টি ফেরত পাঠান, সঙ্গে ছোট্ট একটা নোট :

> যা ঘটবেই তাঁকে নিয়ে আর পরীক্ষা-নিরীক্ষা না করে বরং যা ঘটলে প্রয়োজনীয় শক্তি-সামর্থ্য অর্জিত হয় চল তাই ঘটতে দিই। এই লেখাটি যে লিখেছে তাকে ভুলে যেও; সেই লোকটিকে ক্ষমা করে দিও, সে আর যাই পারুক কখনো কোনো মেয়েকে সুখী করতে পারবে না।[৯]

কিন্তু এর ফল আশানুরূপ হয় নি। আংটি আর নোট পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রেগিন কিয়ের্কেগার্ডের বাড়িতে হানা দিলেন এবং তাকে না পেয়ে তিনিও একটা নোট রেখে এলেন। অনুরোধ করলেন, 'যিশুখ্রিষ্ট এবং তাঁর মৃত বাবার স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা রেখে সোরেন যেন সম্পর্কটা না ভাঙে।' উপর্যুক্ত দু জনের নাম উল্লেখ করার ফলে কিয়ের্কেগার্ডের মন আবার দুর্বল হয়ে পড়ল। তিনি এনগেজমেণ্ট ভেঙে না দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলেন কিন্তু বিয়ের দিন পিছিয়ে দিলেন। তিনি এবার এমন কৌশল নেবেন বলে ঠিক করলেন যাতে রেগিন নিজেই বিয়ে না করার সিদ্ধান্ত নেয়। অর্থাৎ এমন একটা অবস্থা সৃষ্টি করার কথা ভাবলেন যেন রেগিন কিয়ের্কেগার্ডকে নিজের যোগ্য মনে না করে চলে যায়। এ জন্য প্রয়োজন নিখুঁত অভিনয়। তিনি অভিনয় করা শুরু করলেন। তবে নিরবচ্ছিন্ন অভিনয় করতে পারেন নি, মাঝে মাঝে মনে হয়েছে এতে তাঁর পারিবারিক ও ব্যক্তিগত সুনাম নষ্ট হতে পারে। কিন্তু তবুও দোনোমনা করে শেষ পর্যন্ত তিনি অভিনয়টা চালিয়ে গেলেন, কারণ তাঁর পক্ষে বিয়ে ভাঙার আর অন্য কোনো উপায় অবলম্বন করা সম্ভব ছিল না।[১০]

তিনি তাঁর সবটুকু অভিনয়ক্ষমতা দিয়ে চেষ্টা করলেন যাতে সবাই (অন্তত রেগিন) তাঁকে অযোগ্য, অপদার্থ, কাণ্ডজ্ঞানহীন, নিস্পৃহ ইত্যাদি মনে করে। তবে রেগিন হয়তো অভিনয়ের ব্যাপারটা বুঝতে পেরেছিলেন, কিন্তু কিয়ের্কেগার্ডের ব্যবহারে ক্লান্ত ও বিরক্ত হতে হতে এর ১৩ মাস পর ১৮৪১ সালের ১১ অক্টোবর তিনি বিয়ে ভেঙে দেন। এই ঘটনার ৮ বছর পর কিয়ের্কেগার্ড তাঁর জার্নালে লিখেছেন :

> যদি আমি তাকে বিয়ে করতাম তা হলে কী হত? আধ বছর কিংবা তাঁর চেয়েও কম সময়ের মধ্যে সে ক্ষতবিক্ষত হয়ে যেত। আমার ভেতরে অব্যাখ্যেয় কিছু ব্যাপার আছে, যার কারণে আমার সঙ্গে কেউ দিনের পর দিন থাকতে পারবে না বা আমার সঙ্গে কোনো সম্পর্ক তৈরি করতে পারবে না... সে প্রায় এক বছর আমার বাগদত্তা ছিল; তবু সত্যিকার অর্থে সে আমাকে চিনতে পারে নি... তার জন্য আমার বিষণ্নতা ছিল মাত্রাতিরিক্ত।[১১]

এই ঘটনা ছোট্ট শহর কোপেনহেগেনে তুমুল আলোড়ন তোলে। ক্লাব, রেস্তোরাঁ,

---

* এই Rasmus Nielsen-এর সঙ্গে পরে যৌথভাবে তিনি কিছু দার্শনিক লেখা লিখেছিলেন।[১২]

থিয়েটারে বিষয়টি ফুলিয়ে ফাঁপিয়ে বারবার আলোচিত হতে থাকে। অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে কিয়ের্কেগার্ডকে কোপেনহেগেন ত্যাগ করে বার্লিনে চলে যেতে হয়। এ বিষয়ে অধ্যাপক জোসিয়া থম্পসন (Josiah Thompson) মন্তব্য করেছেন :

> রেগিন-র কাছ থেকে তাঁর এই পালিয়ে যাওয়া আসলে সারা জীবন ধরে যে তিনি এই পার্থিব জগৎ থেকে দূরে সরে থাকার চেষ্টা করেছেন, তারই একটি বিশেষ মর্মভেদী বহিঃপ্রকাশ।[১৩]

বার্লিনে তিনি সাড়ে চার মাস ছিলেন। এর মধ্যে তাঁর প্রথম বই *Either/Or* নিয়ে কাজ শুরু করেন। খুব শিগরিগই বইটি দিনেমার সাহিত্যালোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। এর পরের চার বছর কিয়ের্কেগার্ডের হাত থেকে প্রচুর লেখা বেরিয়ে আসে। *Fear and Trembling* ও *Repetition* ১৮৪৩ সালে প্রকাশিত হয়। এর পরপরই প্রকাশিত হয় *Stages on Life's Way* ও *The Concept of Dread*। এই বইগুলোর সাধারণ থিম হচ্ছে রেগিন-র সঙ্গে তার এনগেজমেণ্ট ভেঙে দেওয়ার যাথার্থ্য প্রমাণ করা। এখানে রেগিন-র প্রতি আমাদের পাঠকদের, সাহিত্যানুরাগী বা দর্শন-সন্ধানীদের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না নেওয়াটা অনুচিত হবে। কেননা এই তরুণীর প্রতি কিয়ের্কেগার্ডের বিচিত্র আবেগ ও অনুভূতির অনুরণনেই সৃষ্টি হয়েছে অসংখ্য লেখা যা বিশ্বসাহিত্যে ও দর্শনে এক নতুন মাত্রা যোগ করেছে।

যখন বার্লিনে ছিলেন, কিয়ের্কেগার্ড তাঁর বন্ধু Emil Boesen-এর মারফত রেগিনকে এমন ধারণা দেওয়ার চেষ্টা করতেন যেন বার্লিনে তিনি এক সন্দেহজনক জীবন যাপন করছেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল রেগিন-র মন থেকে নিজের প্রতি শেষ অনুরাগটুকু মুছে ফেলা। কিন্তু আসলে কি সত্যিই তা চেয়েছিলেন? তা হলে ক'দিন পর গৃহশিক্ষক শ্লেগেলের সঙ্গে যখন রেগিন-র এনগেজমেণ্ট হয়ে গেল, তখন তিনি এত অস্থির হয়ে উঠলেন কেন? কেন নানারকম খোঁড়া যুক্তি উত্থাপন করা শুরু করলেন? তিনি যুক্তি দেখালেন, যেহেতু রেগিন কিয়ের্কেগার্ডের মৃত বাবার নাম করে এনগেজমেণ্ট না ভাঙার অনুরোধ জানিয়েছিলেন, তাই তিনি নৈতিকভাবে কিয়ের্কেগার্ডের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আছেন। রেগিন-র এই দ্বিতীয় এনগেজমেণ্ট তাঁকে এত উত্তেজিত করে তুলেছিল যে তিনি *Repetition*-এর শেষ অংশ পরিবর্তন করে আবার নতুন করে লেখেন।[১৪]

এরপর থেকে কিয়ের্কেগার্ড প্রকাশ্যে খ্রিষ্টধর্মের প্রতি তাঁর অনুরাগ প্রকাশ করতে থাকেন, প্রত্যেক ঘটনার পেছনে ঈশ্বরের হাত দেখতে পান এবং বাইবেলের প্যারাব্‌ল্ দিয়ে সবকিছুকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন।

Fear and Trembling পড়লে মনে হয় যে, এ্যাব্রাহামের মতো, পৃথিবীর সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তিকে ঈশ্বরের নিকট উৎসর্গ করতে হবে বলেই তিনি রেগিনকে ত্যাগ করেছেন। নিজেকে এবং নিজের সুখ-আনন্দকে উৎসর্গ করে দেওয়ার এই চিন্তা সারা জীবন ধরেই তাড়িত করেছে তাঁকে। এতদিন পিতার পাপের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে নিজেকে উৎসর্গের জন্য প্রস্তুত করে রেখেছিলেন, এখন সেইসঙ্গে প্রেমাস্পদ রেগিনকেও যুক্ত করে নিলেন।

কিয়ের্কেগার্ডের এই উৎসর্গ খুব সহজ-সরল বিষয় নয়। আপনি ইচ্ছে করলেই এই উৎসর্গ করতে পারবেন না। উৎসর্গ করতে গেলেই প্যারাডক্সের মুখোমুখি হবেন, উৎসর্গ করতে গেলেই আতঙ্ক এসে গ্রাস করবে আপনাকে, উৎসর্গ করতে গেলেই অতলান্ত গহ্বরে ঝাঁপ দেওয়ার অনিশ্চয়তাবোধে তাড়িত হবেন। যদি এইসব প্রতিকূলতা সত্ত্বেও আপনি নিজেকে বা আপনার প্রিয়জনকে উৎসর্গ করতে চান তা হলে আপনার অন্তর্লীন 'বিশ্বাস'কে

অটল করে তুলতে হবে।

পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা এই উৎসর্গ এবং তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকা প্যারাডক্স, ভীতি ও অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে অন্তরে অটল বিশ্বাস নিয়ে ঝাঁপ দেওয়ার জন্য অতলান্ত গহ্বরের মুখোমুখি হব।

তথ্যসূত্র :

১. Schrader Jr,. George Alfred, 1967, *Existential Philosophers : Kierkegaard to Merleau Ponty,* New York, McGraw-Hill Book Company, p. 46

২. Bhattacharya, Asoke, 1991, *Existentialism Kierkegaard Heidegger and Sartre,* Calcutta, p. 29

৩. Ibid., p. 30

৪. Christian, James L., *Philosophy an introduction to the art of wondering,* second edition, p. 664

৫. *Eistentialism Kierkeggard Heidegger and Sartre,* p. 36

৬. Ibid., p. 38

৭. Ibid., p. 39

৮. Ibid., p. 39

৯. Ibid., p. 39

১০. Ibid., p. 40

১১. Hartshorne, M. Holmes, 1990, *Kierkegaard Godly Deceiver,* New York, Columbia University Press, p. 3

১২. *Existentialism Kierkegaard Heidegger and Sartre,* p. 39

১৩. Ibid.

১৪. *Existentialism Heidegger and Sartre,* p. 41

অতলান্ত গহ্বর

তোমরা সর্বদা যেমন বাধ্য হইয়াছ, ... সভয়ে ও সকম্পে নিজ নিজ পরিত্রাণ সাধন কর।
—ফিলিপীয় ২ : ১২

বালকের মতো বিশ্বাস চাই। বালক মাকে দেখবার জন্য যেমন ব্যাকুল হয়, সেই ব্যাকুলতা।
—শ্রীরামকৃষ্ণ

বিশ্বাসে মিলায় হরি তর্কে বহুদূর।

বুদ্ধিবাদী দার্শনিকরা বহুদিন ধরে যে বিমূর্ত আধিবিদ্যক পদ্ধতি (metaphysical system) নির্মাণে সচেষ্ট ছিলেন, তা যেন হেগেলে এসে পূর্ণতা পেল। কিন্তু আমরা দেখেছি ঊনবিংশ শতাব্দীর এই অসাধারণ প্রতিভাবান দার্শনিক কিয়ের্কেগার্ডের তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ ও বিদ্রূপের শিকার হয়েছেন। কারণ সোকি উপলব্ধি করেছিলেন যে, হেগেলের 'নিখুঁত' পদ্ধতিতে তাবৎ বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ধরা দিলেও, ব্যক্তিমানুষ ফাঁক গলে বেরিয়ে গেছে। হেগেলের দর্শন বিমূর্ত, তাই সেখানে মানুষের বিমূর্ত প্রত্যয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু সত্যিকারের ব্যক্তিমানুষ অনুপস্থিত। এ কারণেই কিয়ের্কেগার্ড বারবার জোর দিয়ে বলার চেষ্টা করেছেন দর্শনকে বিমূর্ত হলে চলবে না এবং তার রসদ যোগাড় করতে হবে মূর্ত ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা থেকে। মানুষ যে ঐতিহাসিক পরিস্থিতিতে নিজেকে দেখে সেই ঐতিহাসিক পরিস্থিতির ওপর দাঁড়িয়েই তাকে তার দর্শন নির্মাণ করতে হবে, যাতে দর্শন কেবল 'চিন্তা দর্শন' না হয়ে প্রতিটি মানুষের জীবনের ভিত্তি হয়ে ওঠে। ফলে সোকির দর্শনে চিন্তাসঞ্জাত বিষয় নয়, কেবল অভিজ্ঞতালব্ধ বিষয়ই স্থান পেয়েছে।

সোকি ধর্মে আশ্রয়প্রার্থী আধুনিক যুক্তিবাদী মানুষের সমস্যা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। সোকির সময়ের তুলনায় এই সমস্যা এখন অনেক বেশি তীব্র বলে এই বিংশ শতাব্দীতে, বিশেষ করে মহাযুদ্ধ-পরবর্তী সময়ে তিনি অবিশ্বাস্য জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। কারণ যুক্তি এসে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেললেও সেই পুরোনো ধর্মীয় বিশ্বাসে ফিরে যাওয়ার প্রবণতা কিন্তু কমে নি বরং বেড়েছে। যুক্তির আঁটুনি যত বজ্র হচ্ছে, ধর্মীয় বিশ্বাসে আশ্রয় নেওয়ার আকাঙ্ক্ষাও তত তীব্র হচ্ছে। প্রথম মহাযুদ্ধের আগেও যুক্তির শাসনকে যতটা মানা হত মানুষ এখন আর তা মানতে চাইছে না।* কিন্তু যুক্তি ছেড়ে 'বিশ্বাসে' ফিরে যাওয়াটাও

* বিষয়টি মূলত ইওরোপ ও আমেরিকার উন্নত দেশসমূহের পরিপ্রেক্ষিতে বিবেচনা করা হয়েছে।

সমস্যা। বিজ্ঞান ও বস্তুবাদের যে অসাধারণ সফল্য, তাকে অস্বীকার করে আমি কীভাবে এক অব্যাখ্যেয় বাস্তবতায় বিশ্বাস করব? আমরা যখন দুঃখ-কষ্ট ও অন্যায়-অবিচারে ভরা এই জগতের মুখোমুখি হই, তখন মাথার ওপরে যে পরম শক্তিমান, অশেষ করুণাময় ও চরম ন্যায়বান একজন ঈশ্বর আছেন সে-কথা কী করে মেনে নেব? একদিকে বিজ্ঞান ও বস্তুবাদের অভূতপূর্ব অগ্রগতি, অন্যদিকে এরকম হাজারো অসঙ্গতি—এর মধ্যে থেকে আমাদের পক্ষে কি সত্যিই ধর্মীয় বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরা সম্ভব?

এই সমস্যার মুখোমুখি হয়ে কিয়ের্কেগার্ড বুঝতে পেরেছিলেন যে 'বিশ্বাস'-কে পেতে হলে মানুষকে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার† মধ্য দিয়ে যেতে হবে। ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে 'বিশ্বাস'-কে পাওয়ার এই চেষ্টা নতুন কোনো বিষয় নয়। সোকি তাঁর বক্তব্যের সমর্থনে বাইবেলের দুটো চরিত্র জব ও এ্যাব্রাহামকে উপস্থাপন করলেন। তিনি এই দুটো চরিত্র বিশ্লেষণ করে দেখালেন বিশ্বাস বলতে আসলে কী বোঝায়। সোকি দেখালেন যে বিশ্বাসে পৌছানোর সহজ কোনো রাস্তা নেই। 'বিশ্বাসে' পৌছাতে হলে আপনাকে অবশ্যই 'ভয় ও কাঁপুনি'র (fear and trembling) মধ্য দিয়ে যেতে হবে। এই প্রসঙ্গেই সোকি অস্তিত্ববাদের অন্যতম প্রধান তিনটি ধারণা (idea) স্পষ্টভাবে তুলে ধরলেন। এগুলো হচ্ছে—অনপেক্ষ প্যারাডক্স, উদ্বেগ (angst), এবং অজানার উদ্দেশে অতলান্ত গহ্বরে ঝাঁপ দেওয়া।

বাইবেলের চরিত্র জব। সম্পূর্ণ বিনা কারণে তার কাছ থেকে সব ছিনিয়ে নেওয়া হয়েছে। সব হারিয়ে সে অশেষ দুঃখকষ্টের মধ্যে জীবন যাপন করে। অবশ্য কিয়ের্কেগার্ডের লেখায় যখন উঠে আসে তখন সে আর সেই চিরাচরিত জব নয়। কিয়ের্কেগার্ড তাকে একটু ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখেছেন। তিনি তাঁর বই *Repetition*-এ জবকে উদ্দেশ্য করে লিখেছেন :

> আমার তোমাকেই প্রয়োজন; কারণ তুমি এত উচ্চৈঃস্বরে নিজের অভিযোগ জানাও যে সেই স্বর গিয়ে স্বর্গে প্রতিধ্বনিত হয়, যে স্বর্গে ঈশ্বর, শয়তানের সঙ্গে বসে মানুষের বিরুদ্ধে পরিকল্পনা আঁটেন।[১]

কিয়ের্কেগার্ডের মতে ঈশ্বর ও শয়তানের যোগসাজশেই আমাদের ভাগ্য তৈরি হয়।[২] আমাদের নিজেদের ভাগ্য নির্মাণে আমাদের কোনো ভূমিকা নেই। এমনকি আমরা এও জানি না আমরা কে, কোত্থেকে এসেছি, কোথায়ই বা যাব! *Repetition*-এ আমরা এরকম অনেক প্রশ্নের মুখোমুখি হই।

> আমি আমার আঙুলকে অস্তিত্বের ভেতর ডুবিয়ে দিলাম—এর কোনো গন্ধ নেই। আমি কোথায়? যাকে জগৎ বলা হয়, সেটা কী? সে কে যে আমাকে পার্থিব জগতে প্রলুব্ধ করেছে, এবং ফেলে রেখে চলে গেছে? আমি কে? এই পৃথিবীতে আমি কেন এলাম? এ ব্যাপারে আমার সঙ্গে পূর্বে আলোচনা করা হয় নি কেন? ... যে বিশাল উদ্যোগকে বাস্তবতা বলা হচ্ছে এর প্রতি আমি কীভাবে আগ্রহী হয়ে উঠলাম? কেনই-বা এর প্রতি আমার আগ্রহী হয়ে ওঠা উচিত? এটা কি একটি স্বেচ্ছাধীন বিষয় নয়? [কেন আমি] এতে অংশ নিতে বাধ্য হই?[৩]

এ যেন দেকার্তের সময়কার বিখ্যাত ফরাসি গণিতবিদ, বিজ্ঞানী ও দার্শনিক ব্লেইজ পাস্কালের (১৬২৩-৬২) আর্তনাদের প্রতিধ্বনি। পাস্কাল তাঁর বই *Pensées*-এ

---

† বস্তুগত অভিজ্ঞতা ছাড়াও এখানে বিশেষ করে মানসিক টানাপড়েন ও যন্ত্রণায় ক্ষতবিক্ষত হওয়ার কথা বলা হচ্ছে।

লিখেছেন :

> যখন আমি আমার ছোট জীবনের কথা চিন্তা করি, যে আমি ছোট্ট একটু জায়গা দখল করে আছি, যে আমি অনন্তে ছিলাম এবং আবার অনন্তেই হারিয়ে যাব; যখন আমি বুঝতে পারি যে আমি এমন একটি মহাশূন্যের অসীম বিশালতায় ডুবে আছি যার সম্পর্কে আমি কিছুই জানি না এবং সেও আমার অস্তিত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ উদাসীন, তখন আমি ভয়ে বিহ্বল হয়ে যাই এবং অবাক হয়ে ভাবি, আমি সেখানে না থেকে এখানে আছি কেন এবং অন্য কোনো সময়ে না এসে এখন এসেছি কেন? কে আমাকে এখানে এনেছে? কার আদেশ ও নির্দেশে আমার জন্য এই সময় ও স্থানটুকু বরাদ্দ করা হয়েছে?[৪]

জন্ম (ও মৃত্যু) –রহস্য নিয়ে এই ব্যাকুলতা প্রায় সব অস্তিত্ববাদীদের মধ্যেই পরিলক্ষিত হয়। জীবনের এই রহস্য স্মরণ করিয়ে দিয়ে তাঁরা আমাদের সতর্ক করে দেন যাতে আমরা আমাদের জীবনকে অতি সরলভাবে কিংবা ভুলভাবে না দেখি। জীবনের বেশিরভাগটাই রহস্যে ঢাকা এবং চিরকালই তা রহস্যাবৃত থাকবে। কেউ আমাকে ব্যাখ্যা করে বলতে পারবে না যে কেন আমি আমার জাতি বা যুগে জন্ম না নিয়ে অন্য জাতি বা যুগে জন্ম নিই নি; কেন এই পরিবারেই জন্ম নিতে হল আমাকে, আমার পছন্দমতো অন্য কোনো পরিবারে জন্মগ্রহণ করলে কার কী এমন ক্ষতি হত। জীববিজ্ঞানী, মনস্তত্ত্ববিদ কিংবা সমাজতত্ত্ববিদদের কাছে হয়তো এসব প্রশ্নের উপরভাসা উত্তর আছে। তাঁরা হয়তো তাঁদের বুদ্ধিজাত উত্তরে এই রহস্য–কুয়াশাকে কিঞ্চিৎ আন্দোলিতও করতে পারেন। কিন্তু তাতে অবস্থার কোনো হেরফের হয় না, আমরা যে তিমিরে সেই তিমিরেই থেকে যাই। এ কারণেই এই দুর্জ্ঞেয় রহস্যে হাতড়ে না মরে কিয়ের্কেগার্ড 'বিশ্বাস'–এর স্বরূপ উন্মোচনে সচেষ্ট হন।

যাই হোক, আমরা আবার জবের কথায় ফিরে আসি। জবের বন্ধুরা তাকে সান্ত্বনা দেওয়ার চেষ্টা করে : তার এই কষ্টভোগ হচ্ছে তার কর্মফল, পাপের শাস্তি; সে যদি নিঃশর্তে তা মেনে নেয় তা হলে আবার সব ঠিক হয়ে যাবে।[৫] কিন্তু জবকে সান্ত্বনা দেওয়া অত সহজ নয়, কারণ সে জানে যে এরকম ব্যাখ্যায় কোনো সত্যতা নেই। সে চরম হতাশায় পতিত হয়, কারণ ঈশ্বরের বিপরীতে অবস্থান করেও সে অনুভব করে যে সে সঠিক : "জবের ভেতরের গূঢ় কথা, তার প্রাণশক্তি, স্নায়ু বা আইডিয়াটা হচ্ছে, সবকিছুর পরও জব সঠিক পথে আছে...সে দাবি করে ঈশ্বরের সঙ্গে তার সুসম্পর্ক আছে, সে জানে যে অন্তরের অন্তরতম স্থলে সে শুদ্ধ ও নিষ্পাপ, তার হৃদয়ের গহীনতম কোণটিও জানে যে এর কোনো কিছুই ঈশ্বরের অজ্ঞাত নয়, এবং তবুও অস্তিত্বের পুরোটাই তার বিরুদ্ধাচরণ করে।"[৬] সে জানে সে সঠিক এমনকি ঈশ্বরের বিপরীতে থেকেও সে সঠিক কিন্তু সে আবার এও জানে যে ঈশ্বরের বিপরীতে অবস্থান করে তার পক্ষে সঠিক হওয়া সম্ভব নয় এই অনপেক্ষ প্যারাডক্সের মুখোমুখি হয়ে সে গভীর হতাশায় পতিত হয়। তবে একই সঙ্গে তার কিছু লাভ হয়। নিজের ভেতরে বিশ্বাস আনতে গেলে যা যা প্রয়োজন, সে–সব বিষয় সম্পর্কে সে পরিষ্কার ধারণা লাভ করে, এবং চূড়ান্ত বিচারে তার নিজের পথটি যে সঠিক নয় তা আবিষ্কার করে। সে হৃদয়ঙ্গম করে : ঈশ্বর মানুষের তুলনায় এত বড় যে তাঁকে পুরোপুরি বোঝার আশা করা বৃথা। এ কারণেই ঈশ্বর সম্পর্কিত কোনো বিষয়কে অদ্ভুত কিংবা বিসদৃশ মনে হলেও আমাদেরকে তা গ্রহণ করতে হয়। জব সবকিছুর জন্যই ঈশ্বরের প্রশংসা করে। এমনকি কুমির বা হিপোপটেমাসের মতো যে–সব প্রাণীকে অর্থহীন বা উদ্দেশ্যহীন বলে বোধ হয়

সে-সব প্রাণী সৃষ্টির জন্যও তাকে ঈশ্বরের প্রশংসা করতে হয়।[৭] বিশ্বাসের অর্থ হচ্ছে পরিপূর্ণ আত্মসমর্পণ; "বিশ্বাস করার জন্য [আমাকে অবশ্যই] আমার চোখ বন্ধ করতে হবে এবং আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে অযৌক্তিকতায় ঝাঁপ দিতে হবে।"[৮] আমাকে অবশ্যই অতলান্ত গহ্বরে ঝাঁপ দেওয়ার ঝুঁকি নিতে হবে।

এ্যাব্রাহামের গল্পে বিশ্বাস করার এই প্রক্রিয়াগুলো আরো চমৎকারভাবে বিধৃত হয়েছে। সোকি এ্যাব্রাহামের গল্পটিকেও ভিন্ন ঢঙে উপস্থাপন করেছেন; তিনি তাঁর 'অস্তিত্ববাদী অবস্থা'তে পুনরায় প্রাণ সঞ্চারের চেষ্টা করেছেন। ঈশ্বর এ্যাব্রাহামকে কথা দিয়েছিলেন যে "তাঁর বীজের আশীর্বাদে পুষ্ট হবে পৃথিবীর সব জাতি,* সময় বয়ে গেল, ঈশ্বরের নিজের কথা (সেই অঙ্গীকারটি) অমূলক প্রমাণিত হল। এ্যাব্রাহামের বিশ্বাসে ভাটা পড়ল না।"[৯] যখন খুব বৃদ্ধ, একটি মাত্র সন্তান জন্ম নিল তাঁর, কিন্তু তখন তাঁকে ওই সন্তানটি উৎসর্গ করতে বলা হল। "ফলে সব হারিয়ে গেল—কিছুই পাওয়া না গেলে যতটা ভয়ঙ্কর বোধ হত, এই হারিয়ে যাওয়া কি তার চেয়েও বেশি ভয়ঙ্কর! তা হলে ঈশ্বর কি এ্যাব্রাহামকে নিয়ে শুধু খেলাই করলেন! তিনি অলৌকিকভাবে অবাস্তবকে বাস্তব করে তুললেন, এখন আবার তাকে নিশ্চিহ্ন করে দিচ্ছেন...এ কোন ঈশ্বর যে হেঁচকা টানে বৃদ্ধ মানুষের হাতের লাঠি কেড়ে নেয়...এ কোন ঈশ্বর যে একজন বৃদ্ধ মানুষের শুভ্র শ্মশ্রুকে অস্বস্তিকর করে তোলে, এ কে যে চায় যে সে [এ্যাব্রাহাম] নিজেই এটা করুক? এই শ্রদ্ধেয় বৃদ্ধ বা ওই নিষ্পাপ শিশুটির জন্য কি কোনো সমবেদনা নেই? এবং সবকিছুর পরও এ্যাব্রাহাম হচ্ছেন ঈশ্বরের নির্বাচিত ব্যক্তি এবং ঈশ্বর নিজেই তাঁর উপর এই কঠিন পরীক্ষা চাপিয়ে দিয়েছেন। এখন নিশ্চয়ই সব হারিয়ে গেল। মানবজাতির গৌরবোজ্জ্বল স্মৃতি হারিয়ে গেল, হারিয়ে গেল এ্যাব্রাহামের বীজ সম্পর্কিত সেই প্রতিজ্ঞাটি†।[১০] এই হতাশাকে বহন করতে হবে; উৎসর্গের কাজটি তৎক্ষণাৎ সম্পন্ন করে এ্যাব্রাহাম হতাশায় ভোগার সময়কে সংক্ষিপ্ত করতে পারেন না; যেখানে উৎসর্গ করতে হবে সেই পাহাড়ে পৌঁছাতে যেন অন্তহীন তিন দিন ও তিন রাত ধরে পথ অতিক্রম করতে হয় তাঁর। কিয়ের্কেগার্ড এমনভাবে বর্ণনা দেন যে আমরা এই দীর্ঘ ভ্রমণের যন্ত্রণা অনুভব করি;[১১] তারপর এই পরীক্ষার শেষ মুহূর্তগুলোর বর্ণনা পড়তে পড়তে আমরা বিচলিত ও আতঙ্কিত হয়ে পড়ি— কাঠ সংগ্রহ, ছুরি শানানো, অলৌকিক ঘটনার ঠিক আগের কয় সেকেণ্ডের অবর্ণনীয় মানসিক নির্যাতন।[১২] ওহ! কী ভয়ানক এই ভয় ও কাঁপুনি, কী সাঙ্ঘাতিক এই ভীতি ও আতঙ্ক! তবুও আরেকবার সেই অনপেক্ষ প্যারাডক্স (absolute paradox) তৈরি হয়। সব ঘটনাই যখন বিপক্ষে তখনো আশা ও বিশ্বাস জেগে থাকে; অন্তরের গহীনে কোথাও-না-কোথাও এ্যাব্রাহাম নিশ্চয়ই 'পরিপূর্ণ বিশ্বাস'-কে বহন করে চলেন : তাঁর বিশ্বাস, একসময় সব ঠিকঠাক হয়ে যাবে, এখন যাকে অর্থহীন মনে হচ্ছে তাই একসময় অর্থপূর্ণ হবে। কারণ আর কেউ নয় স্বয়ং ঈশ্বরই তাঁকে নিজ-সন্তান হত্যা করার নির্দেশ দিয়েছেন।[১৩] এ্যাব্রাহামের মনে যদি এই বিশ্বাস না থাকত তা হলে তিনি ঈশ্বরের

---

* "অতএব জানিও, যাহারা বিশ্বাসাবলম্বী, তাহারাই এ্যাব্রাহামের সন্তান। আর বিশ্বাস হেতু ঈশ্বর পরজাতিদিগকে ধার্মিক গণনা করেন, শাস্ত্র ইহা অগ্রে দেখিয়া এ্যাব্রাহামের কাছে আগেই সুসমাচার প্রচার করিয়াছিল, যথা, 'তোমাতে সমস্ত জাতি আশীর্বাদ প্রাপ্ত হইবে'।" (গালাতীয় ৩.৮)

† "আমি তোমা হইতে এক মহাজাতি উৎপন্ন করিব, এবং তোমাকে আশীর্বাদ করিয়া তোমার নাম মহৎ করিব, তাহাতে তুমি আশীর্বাদের আকর হইবে।...এবং তোমাতে ভূমণ্ডলের যাবতীয় গোষ্ঠী আশীর্বাদ প্রাপ্ত হইবে।" (জেনেসিস ১২.২-৩.)

আদেশ মানতে পারতেন না। কারণ তখন তাঁর সন্তান-হত্যার বিষয়টি একটি সাধারণ 'খুন'-এ পরিণত হত। কিন্তু প্যারাডক্স এখনো রয়ে গেছে এবং তা শেষ পর্যন্ত থাকবে; এ্যাব্রাহাম কাউকে তাঁর বিশ্বাসের কথা বলতে পারেন না, এমনকি নিজের কাছেও তা গোপন রাখতে হয়,* কেননা এ্যাব্রাহামের এই গভীর বিশ্বাসের বিষয়টি যদি প্রকাশিত হয়ে যায় তা হলে মোরিয়া (Moriah) পাহাড়ের উদ্দেশ্যে ছেলেকে নিয়ে তিন দিন তিন রাত ধরে এই কষ্টকর যাত্রা, এই ভয়ানক মানসিক কষ্ট, সবকিছুকেই ভান মনে হবে, শেষ পর্যন্ত সবকিছুই হাস্যাস্পদ হয়ে যাবে।[১৪] একদিকে ঈশ্বর এই ভয়ঙ্কর দাবি করেন আবার চূড়ান্ত পর্যায়ে তিনিই গভীর কষ্ট ও হতাশা থেকে উদ্ধার করেন। শাস্তিদাতা ঈশ্বরের ভয়ঙ্কর রূপ এবং ত্রাতা ঈশ্বরের করুণাময় প্রকাশের মধ্যে এই যে অসমাধানযোগ্য দ্বন্দ্ব—এ্যাব্রাহামকে তা উপলব্ধি করতে হয়, যাতে তিনি ভয় ও আশার পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারেন। 'আশা' কেবল অনুভূত হয়, তাকে প্রকাশ করা যায় না। আর আপাতদৃষ্টিতে সবকিছু বিপক্ষে থাকার পরও আস্থা অনুভব করার, কোনো কিছু গ্রহণ করার এবং নিজেকে বা নিজের প্রিয়তম বিষয়কে সমর্পণ করার ইচ্ছাকে নিরন্তর মনের ভেতর নব নব রূপে জাগিয়ে রাখার নামই হচ্ছে বিশ্বাস।† এই বিশ্বাসকে যুক্তিতে পাওয়া যায় না। নিশ্ছিদ্র যুক্তিজালে এই বিশ্বাসকে ধরতে চাইলে তা অর্থহীন হয়ে পড়ে, সুতরাং এক্ষেত্রে যুক্তিকে পরিত্যাগ না করে কোনো উপায় নেই।

কিয়ের্কেগার্ডের 'উদ্বেগ', 'ভয়' বা 'dread' কোনো নির্দিষ্ট বোধগম্য আতঙ্ক নয়, কোনো বিপদ সম্পর্কে এমন কোনো ভীতি নয় যাকে ঠেকিয়ে রাখা যায়। এটা পায়ের নিচ থেকে মাটি সরে যাওয়ার অনুভূতি, সব নিরাপত্তা ও নিশ্চয়তা হারানোর বোধ। এটা এমন এক অবস্থা যখন ঈশ্বরকেও বিশ্বাস করা যায় না। এই মৌলিক ও আধিবিদ্যক (meta-physical) আতঙ্কে যখন জীবনের সব ভিত্তিগুলো কেঁপে ওঠে কেবল তখনই, কিয়ের্কেগার্ড বলেন, মানুষ ধর্মের গভীরতর বাস্তবতাকে আবিষ্কার করে এবং সে সম্পর্কে পরিপূর্ণ অভিজ্ঞতা লাভ করে। উপরন্তু সমুখে প্রলম্বিত অনপেক্ষ প্যারাডক্সের (absolute paradox) কারণেই কোনো সহজ শর্ট-কাট রাস্তা বেছে নেওয়া সম্ভব হয় না। 'অতলান্ত খাদে' ঝাঁপ দেওয়ার জন্য এগিয়ে যেতে হয়, সেই গভীর শূন্যতায় লাফ দেওয়ার প্রয়োজন হয়ে পড়ে যার 'নিঃসীম নঞর্থতা' (absolute nothingness) আমাকে ঈশ্বরের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে রেখেছে কিন্তু এখানে মনে রাখতে হবে, এই ঈশ্বর হচ্ছে সেই ঈশ্বর যে ঈশ্বর ঈশ্বর হওয়ার জন্য মানবীয় সব জ্ঞানের সীমা ছাড়িয়ে ঊর্ধ্বে উঠে গেছে।[১৫]

আমাদের সামনে প্রলম্বিত অনড় প্যারাডক্স থাকলেও একটি বিষয় আমাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যায়। ভয় ও কষ্টকে স্বীকার করে আমরা যদি এই পুরো প্যারাডক্সের মুখোমুখি দাঁড়াবার সৎসাহস অর্জন করতে পারি, তা হলে যে অভিজ্ঞতা আমরা লাভ করব সেই অভিজ্ঞতাই আমাদের সহায় হবে। যত আন্তরিকভাবেই চাই না কেন আমার পক্ষে জোর করে কারো

---

* এখানে হ্যামলেটের কথা মনে করা যেতে পারে। Philip Edwards তাঁর '"Tragic Balance in 'Hamlet' " প্রবন্ধে কিয়ের্কেগার্ডের এ্যাব্রাহামের সঙ্গে শেক্সপীয়রের হ্যামলেটের সাযুজ্য লক্ষ করেছেন।[১৬]

† কিয়ের্কেগার্ড তাঁর *Concluding Unscientific Postscript* গ্রন্থে লিখেছেন, 'বিশ্বাসের দুটো কাজ আছে : অসম্ভব বা প্যারাডক্সকে আবিষ্কার করার ব্যাপারে প্রতি মুহূর্তে সতর্ক থাকা; এবং তারপর অন্তর্গততার আবেগ নিয়ে তাকে প্রবল বেগে আঁকড়ে ধরা।'[১৭]

ওপর বিশ্বাস চাপিয়ে দেওয়া সম্ভব নয়, এমনকি আমি তা নিজের ওপরও চাপাতে পারি না। কিন্তু তাই বলে যে আমি একেবারে ক্ষমতাহীন তা নই, যে অবস্থাতেই থাকি না কেন আমি ঝাঁপ দেওয়ার ঝুঁকি নিতে পারি। এক্ষেত্রে প্যারাডক্স থাকার ফলে সবক্ষেত্রেই বেদনাদায়ক ঝুঁকি ও আতঙ্ক-বোধের বিষয়টি অবশ্যম্ভাবী হয়ে ওঠে। তবে ঝুঁকি ও আতঙ্ক থাকলেও এই ঝাঁপ দেওয়ার সিদ্ধান্ত আমাকে নিতেই হয়, কেননা কোনো বিমূর্ত ও সাধারণভাবে বৈধ যুক্তিতে এই প্যারাডক্সের সমাধান সম্ভব নয়। উপরন্তু এই সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টি একেবারে ব্যক্তিগত এবং প্রত্যেককে ব্যক্তিগতভাবে এর অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয়। "হয় অনপেক্ষর (absolute) সঙ্গে অনপেক্ষ সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়ে একজন ব্যক্তিকে এই প্যারাডক্সের (paradox) অংশীদার হতে হবে, না হয় এ্যাব্রাহাম হারিয়ে যাবে।"[১৮] ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ব্যক্তিসত্তা হিসেবে এই বিশ্বজগতে একজন মানুষের ভূমিকা হয়তো খুবই তুচ্ছ, কিন্তু মানুষের পক্ষে সেই অনপেক্ষতার (absoluteness) অভিজ্ঞতা অর্জন সম্ভব যা তাকে ঈশ্বরের অনপেক্ষতার সঙ্গে যুক্ত করে। প্যারাডক্সের উপস্থিতির কারণেই আমরা নিশ্চিত হয়ে যাই যে ঝাঁপ দিতে গেলে আমাদের ঝুঁকি নিতেই হবে এবং আমরা এও উপলব্ধি করি যে ঝাঁপ দেওয়ার ফলাফল ভালো হবে কি মন্দ হবে তা আগেভাগে জানা সম্ভব নয়। কেবল ঝাঁপিয়ে পড়ার পরই জানা যাবে কোনটি সঠিক এবং কোনটি ভুল। এই ঝুঁকির কারণেই আমার পক্ষে গভীরভাবে পরিপূর্ণ সেই অভিজ্ঞতা অর্জন সম্ভব, যা দিয়ে আমি আমার আধিবিদ্যক (metaphysical) ভয়কে জয় করতে পারি। ফলে ঝুঁকি থাকলেও আমাদের ঝাঁপ দিতে হবে। তবে কিয়ের্কেগার্ড বিশ্বাস করেন, যদি আমরা চোখ কান বন্ধ করে ঝাঁপ দিয়ে দিই তো সোজা গিয়ে "ঈশ্বরের বাড়িয়ে দেওয়া দু-হাতের মধ্যেই"[১৯] পড়ব।

অনেকে অভিযোগ করেন যে প্যারাডক্সের ওপর বেশি জোর দিতে গিয়ে যুক্তিকে অন্যায়ভাবে আক্রমণ করেছেন সোকি। এটা অনেকাংশে সত্যি। কারণ তিনি বলেছেন, "প্যারাডক্স হচ্ছে এমন একটি বিষয় যা চিন্তা দিয়ে সমাধান করা যায় না, কারণ বিশ্বাসের শুরু সেখানেই, যেখান থেকে চিন্তা অপসৃত হয়।"[২০] আবার অনেক ক্ষেত্রে এটা সত্যি নয়, কারণ কিয়ের্কেগার্ড যুক্তি ও বুদ্ধিকে যতটা সম্ভব ব্যবহার করেছেন। অযৌক্তিকতা যেন অপ্রয়োজনে বা অযৌক্তিকভাবে প্রথমেই ঢুকে না পড়ে সেদিকে দৃষ্টি রেখেছেন। যেখানে আর কোনো উপায় নেই কেবল সেক্ষেত্রেই অযৌক্তিকতাকে প্রশ্রয় দিয়েছেন। তিনি সেখানেই অযৌক্তিকতার আশ্রয় নিয়েছেন যেখানে যৌক্তিকতার কার্যকারিতা লোপ পায়।

সোকি, ঈশ্বর ও মানুষের মাঝে অবস্থানরত, গভীর ও দুর্জ্ঞেয় খাদটির ওপর বেশি জোর দিয়েছেন। খাদটি এমনই অগম্য ও দুর্লঙ্ঘ্য যে ঈশ্বর না চাইলে স্বর্গ থেকে কোনো ঐশ্বরিক স্ফুলিঙ্গের পক্ষে মানুষের অন্তরকে স্পর্শ করা সম্ভব নয়। তাই যদি হবে তা হলে তো ঈশ্বরের করুণা ভিন্ন কোনো মানুষ ঈশ্বরকে পাওয়ার জন্য অতলান্ত গহ্বরে লাফ দেওয়ার কোনো তাগিদ অনুভব করবে না। অর্থাৎ মানুষ ইচ্ছে করলেই, স্বাধীনভাবে, ঈশ্বরের উদ্দেশে লাফ দেওয়ার ইচ্ছে অনুভব করতে পারবে না।* ফলে সোকি যত প্রাঞ্জল বা বিশ্বাসযোগ্যভাবেই বিষয়টিকে উপস্থাপন করুন না কেন কোনো লাভ হবে না, কারণ আমি ততক্ষণ পর্যন্ত লাফ দেব না যতক্ষণ না ঈশ্বর আমার ওপর করুণা বর্ষণ করছেন। আর ঈশ্বর যদি করুণা বর্ষণ

---

* অগাস্টিন বলেছিলেন যে মানুষ কেবল পাপ করার ক্ষেত্রেই স্বাধীন, তার ভেতর যা কিছু সদর্থক উপাদান বিদ্যমান সবই ঈশ্বর কর্তৃক প্রদত্ত।[২১] পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখব, সোকিও বলেছেন যে শত চেষ্টাতেও শাশ্বত সত্য লাভ করা যায় না— যদি-না ঈশ্বর নিজে সত্যকে প্রদান করেন।[২২]

করেনই তা হলে তো এতসব আলোচনা বা উপলব্ধির আর প্রয়োজন পড়ে না।

যাই হোক, সোকির কথা হচ্ছে ঈশ্বরকে পেতে হলে আপনাকে ভয়ঙ্কর আতঙ্কের মধ্য দিয়ে যেতে হবে। ভয়ঙ্কর আতঙ্কে কাঁপতে কাঁপতেই মানুষ পরিপূর্ণ অনিশ্চয়তা ও নঞর্থতার (nothingness) অভিজ্ঞতা লাভ করে। এই আতঙ্ক, অনিশ্চয়তা ও নঞর্থতার কারণে ভেঙে পড়লে চলবে না, কারণ এইসব অভিজ্ঞতাই মানুষের ভেতরকার সদর্থক গুণাবলিকে বের করে নিয়ে আসতে পারে। আতঙ্কে ভুগে, অনিশ্চয়তায় আক্রান্ত হয়ে কিংবা নঞর্থতায় হারিয়ে যেতে যেতে একজন মানুষ গভীর হতাশায় নিমজ্জিত হয় ও নিজ সত্তাকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধি করে, এবং এমন এক বাস্তবতার সন্ধান পায় যে বাস্তবতার অভিজ্ঞতা তাকে সব ধরনের পরিস্থিতির মুখোমুখি হওয়ার শক্তি যোগায়। কিয়ের্কেগার্ড বলেছেন, একজন মানুষ গভীর হতাশায় নিমজ্জিত হলে সে তার নিজ সত্তাকে পরিপূর্ণভাবে উপলব্ধির এবং সব ধরনের বিপদ মোকাবিলা করার মতো শক্তি অর্জন করবেই, তা যদি না করে তা হলে বুঝতে হবে ওই মানুষটি আসলে গভীর হতাশার স্বাদ পায় নি।*

এই হতাশা, প্যারাডক্স, ভয়ঙ্কর আতঙ্কে কাঁপতে কাঁপতে সম্পূর্ণ অনিশ্চয়তার মধ্যে মনের ভেতর নিশ্চিত বিশ্বাস এনে অতলান্ত গহ্বরে ঝাঁপ দেওয়া, ইত্যাদি প্রসঙ্গ উত্থাপন করার পর সোকি–পরবর্তী খ্রিস্টান জগতে খ্রিস্টান হওয়ার বিষয়টি আর সহজসাধ্য রইল না; কিয়ের্কেগার্ডের পূর্ববর্তী ধর্মতত্ত্ববিদ ও দার্শনিকরা একের পর এক এসে খ্রিস্টীয় পথকে যথাসাধ্য মসৃণ করার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তিনি একে উল্টো আরো দুর্গম করে তুললেন। তবে এখানে উল্লেখযোগ্য বিষয় হল, এরকম অভিনব দৃষ্টিভঙ্গিতে খ্রিস্টধর্মকে উপস্থাপন করার ফলে বুদ্ধিজীবীদের দৃষ্টি আকর্ষিত হল। খ্রিস্টধর্মও যেন তার হারানো গৌরব ফিরে পেয়ে ইউরোপীয় বিদ্বৎসমাজে জায়গা করে নিল। কিয়ের্কেগার্ডের আপাতভয়ঙ্কর দাবি মানুষকে হতোদ্যম করে তোলে নি কারণ খ্রিস্টধর্মে যা নেই বলে নিট্‌শে (১৮৪৪–১৯০০) উপহাস করেছিলেন সোকি সেখানে আবার সেই ওজস্বিতা ও 'রাজকীয়তা'–কে ফিরিয়ে আনলেন।[২৩]

---

* এখানে উল্লেখ্য John Bunyan (১৬২৮–১৬৮৮)–এর যে বইটি খ্রিস্টানদের মধ্যে ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল সেই *The Pilgrim's Progress* নামের allegory-তেও হতাশার বিষয়টি একইভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। বইটির দুটি চরিত্র Christian ও Pliable তাদের শহর (City of Destruction) থেকে ঈশ্বরের নৈকট্যলাভের আশায় স্বর্গের (Celestial City) দিকে এক বিপদসঙ্কুল যাত্রা শুরু করে। তাদের যাত্রাপথে প্রথম বড় ধরনের বিপত্তি হচ্ছে হতাশার জলাভূমিতে (Slough of Despond) পড়ে যাওয়া। এখানে পড়ে যাওয়ার ফলে দুটি চরিত্রের ভেতর দু–ধরনের প্রতিক্রিয়া হয়। হতাশায় দমে গিয়ে Pliable আবার তার নিজ শহরে ফিরে যায়, কিন্তু Christian আরো বেশি মানসিক শক্তিতে বলীয়ান হয়ে নবোদ্যমে তার যাত্রা শুরু করে। এখানেই শেষ নয়, বহু বাধাবিঘ্ন পেরিয়ে স্বর্গের কাছাকাছি এসে Christian, আরেকজন স্বর্গযাত্রী Hopeful সহ 'হতাশা' নামক দৈত্য (Giant Despair) এবং তার স্ত্রী 'অবিশ্বাস' (Diffidence) কর্তৃক তাদের বাড়ি Doubting Castle–এ বন্দি হয়। সেখানে তারা Giant Despair–এর হাতে মৃত অনেক স্বর্গযাত্রীর হাড়গোড় পড়ে থাকতে দেখে। একসময় গভীর হতাশায় ভুগতে ভুগতে তারাও যখন মৃতপ্রায়, তাদের মনে পড়ে যায় প্রতিজ্ঞা (Promise) নামের একটি চাবির কথা। সেই চাবি দিয়ে দরজা খুলে যখন বেরিয়ে আসে আগের চেয়েও সবল বোধ করে তারা, দৃঢ় প্রত্যয়ে স্বর্গের দিকে এগিয়ে যায়।

তথ্যসূত্র :

১. Roubiczek, Paul, 1966, *Existentialism for and against,* Cambridge, Cambridge University Press, p. 57

২. Ibid., p.57

৩. Ibid., p.57

৪. Ibid., p. 57

৫. Ibid., p.58

৬. Ibid., p.58

৭. Ibid., p.58

৮. Kierkegaard, Søren, 1941, *Fear and Trembling*, Princeton, p.44

৯. Kierkegaard, Søren, 1985, *Fear and Trembling*, trans. Alastair Hannay, Middlesex, Penguin Books, p.51

১০. Ibid., p.53

১১. Ibid., p.45

১২. Ibid., p.55

১৩. Ibid., p.53

১৪. Roubiczek, Paul, 1966, *Existentialism for and against,* Cambridge, Cambridge University Press, p.59

১৫. Ibid., p.53

১৬. Wells, Stanley (ed.), 1983, *Shakespeare Survey 36,* Cambridge, Cambridge University Press, p. 50

১৭. Kierkegaard, Søren, 1941, *Concluding Unscientific Postscript,* trans. D. F. Swenson and W. Lowrie, Princeton, Princeton University Press, Book II, Part 2, Chap 2, উদ্ধৃত, Hartman, James B. (ed.), 1967, *Philosophy of recent times,* Vol. 1. New York, McGraw-Hill Book Company, p. 244.

১৮. Kierkegaard, Søren, 1941, *Fear and Trembling,* Princeton, p.187

১৯. Roubiczek, Paul, 1966, *Existentialism for and against,* Cambridge, Cambridge University Press, p.61

২০. Kierkegaard, Søren, 1941, *Fear and Trembling,* Princeton, p.78

২১. Roubiczek, Paul, 1966, *Existentialism for and against,* Cambridge, Cambridge University Press, p.61

২২. নীরুকুমার চাকমা, ১৯৯৭, *অস্তিত্ববাদ ও ব্যক্তি স্বাধীনতা,* ঢাকা, বাংলা একাডেমী, পৃ: ৪৩

২৩. Roubiczek, Paul, 1966, *Existentialism for and against,* Cambridge, Cambridge University Press, p.62

খ্রিস্টধর্ম

ঈশ্বর সম্পর্কিত জ্ঞান ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে। —পাস্কাল

খ্রিষ্টীয় কোমলতার বিপরীতে আমি খ্রিষ্টীয় কঠোরতা নই। আমি .... কেবল মানবীয় সততা।
—কিয়েৰ্কেগার্ড

হিসাব কষে হিরো হওয়া যায় না। —জে. এইচ. নিউম্যান

সোকির মতে খ্রিস্টধর্ম হচ্ছে একটি অবাস্তব ও অযৌক্তিক ধর্ম।[১] তবে এই অবাস্তবতা বা অযৌক্তিকতার কারণে খ্রিস্টধর্মের কোনো ক্ষতি হয় নি, বরং লাভ হয়েছে; কারণ যে ধর্ম যত অবাস্তব ও অযৌক্তিক সে ধর্মে বিশ্বাস করা তত সহজ। এদিক দিয়ে, কিয়েৰ্কেগার্ডের মতে, খ্রিস্টধর্ম হচ্ছে সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম।

খ্রিস্টধর্মে যে বলা হয়েছে, ঈশ্বর মানুষের বেশে এই পৃথিবীতে সময়াধীন হয়েছেন, একজন রক্তমাংসের মানুষ হিসেবে জন্মগ্রহণ করেছেন—এই ঘটনাকে কোনো যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা করা যাবে না। যুক্তি দিয়ে বিচার করলে কখনো মেনে নেওয়া যাবে না যে শাশ্বত সত্য ঈশ্বর, মানুষ হয়ে জন্ম নিয়ে সময়াধীন হয়েছিলেন।* যদি যুক্তি দিয়ে তা মানা যেত, কিয়েৰ্কেগার্ড বলেন, তা হলে আমার বিশ্বাস করা বা না করার প্রশ্নটি গুরুত্ব পেত না। যেহেতু এই ঘটনা যুক্তিবহির্ভূত, তাই আমার একে বিশ্বাস করার সুযোগ আছে। এবং আমি যদি খ্রিস্টান হতে চাই তা হলে এই উদ্ভট ঘটনাকে বিশ্বাস করতে হবে। আমাকে অবশ্যই নিশ্চিতভাবে মেনে নিতে হবে যে সত্য বস্তুগতভাবে উদ্ভট, অযৌক্তিক ও অসম্ভব এবং এই উদ্ভট, অযৌক্তিক ও অসম্ভব বিষয়কেই মনেপ্রাণে ও প্রবলভাবে বিশ্বাস করতে হবে, কেননা অসম্ভবই একমাত্র বিশ্বাসের বস্তু; অন্য কথায় একমাত্র অসম্ভবকেই বিশ্বাস করা সম্ভব।[২]

কিয়েৰ্কেগার্ডের আগে আর কোনো আস্তিক দার্শনিক খ্রিস্টধর্ম বা ঈশ্বরের কার্যকলাপকে এরকম অদ্ভুত বা অযৌক্তিক বলেন নি। পূর্বে কোনো ধর্মতত্ত্ববিদ বা দার্শনিক বলেন নি যে

---

* সোকি তাঁর *Concluding Unscientific Postscript*-এ লিখেছেন : খ্রিস্টধর্ম সম্পর্কে অনেক অদ্ভুত, দুঃখজনক ও ঘৃণ্য কথা বলা হয়েছে; কিন্তু এই বিষয়ে সবচেয়ে বোকার মতো যা বলা হয়েছে তা হচ্ছে—এটা কিছু পরিমাণে সত্য।

উদ্ভট ও অযৌক্তিক বলেই খ্রিষ্টধর্মকে বিশ্বাস করতে হবে। তাঁরা সবাই যুক্তি দিয়ে ধর্মের যাথার্থ্য ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণের চেষ্টা করেছেন। যে-সব মতের সমষ্টিকে সত্য বলে গ্রহণ করলে খ্রিষ্টান হওয়া যায়, এঁরা সে-সব মতকে যুক্তিসঙ্গত বলে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। যেমন কাণ্ট বলেছেন, "খ্রিষ্টধর্মের প্রধান মতগুলো ব্যবহারিক প্রজ্ঞার অপরিহার্য স্বীকার্য সত্য এবং সেগুলোকে নৈতিকতার ধারণার পূর্বস্বীকার্য হিসেবে স্বীকার করতেই হবে।" এই ধারার দার্শনিকরা যিশুর মতের যাথার্থ্য প্রমাণ করার জন্য যৌক্তিক নীতি উপস্থাপন করে যারপরনাই তৃপ্তি অনুভব করেছেন। এ প্রসঙ্গে হেগেল আরো এক ধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেন, খ্রিষ্টধর্মের মতগুলো আর কিছুই নয়, সমগ্র পাশ্চাত্য চিন্তাধারার যৌক্তিক ও বৈজ্ঞানিক পরিণতি মাত্র।[৩]

কিন্তু কিয়ের্কেগার্ড বলেছেন যুক্তি ও বিজ্ঞানের মাধ্যমে খ্রিষ্টধর্মের মতো কোনো অদ্ভুত ধর্মকে বিশ্বাস করতে যাওয়াটা বাতুলতা। তিনি *Concluding Unscientific Postscript*-এ বুদ্ধিবাদী দার্শনিকদের ঠাট্টা করে বলেছেন : বুদ্ধিবাদী দার্শনিকদের কথা শুনে একজন মানুষ যদি উদ্ভট কোনো বিষয়কে বিশ্বাস করার সময় নিজের নিরাপত্তার কথা ভেবে বিষয়টির বিষয়গত সত্যাসত্য যাচাই করতে চায় তা হলে কী হবে? বুদ্ধিবাদীদের approximation প্রক্রিয়ায় উদ্ভট বিষয়টিকে একটু অন্যরকম দেখাবে; এটার অস্তিত্বকে আর অসম্ভব মনে হবে না, ধীরে ধীরে এটার সম্ভাবনা বাড়বে, এটা চরম সম্ভাবনাময় একটি বিষয়ে পরিণত হবে। এখন সে এটা বিশ্বাস করার জন্য প্রস্তুত হবে এবং সে স্পর্ধাভরে দাবি করবে যে এখন তার 'বিশ্বাস' একজন মুচি এবং দরজি এবং একজন সাধারণ মানুষের 'বিশ্বাস' নয়। এই বিশ্বাস সে অনেক কষ্ট করে অর্জন করেছে। এখন সে এটা বিশ্বাস করার জন্য প্রস্তুত; এবং দেখ! এখন এটা বিশ্বাস করা একেবারে অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছে। যে বিষয়টি প্রায়সম্ভব, বা সম্ভব, অথবা চরম সম্ভাবনাময় তাকে অনেকটাই-জানা যায় বা জানা যায়, বা প্রায় চরমভাবে জানা যায় কিন্তু তাকে বিশ্বাস করা অসম্ভব। কারণ উদ্ভট বিষয়ের ওপরই আস্থা স্থাপন করা যায়, এবং কেবল উদ্ভট বিষয়কেই বিশ্বাস করা যায়।

কিয়ের্কেগার্ড খ্রিষ্টধর্মকে পণ্ডিতের চোখে না দেখে খুব সাদামাটাভাবে সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে দেখলেন। তিনি বুঝলেন যতই যুক্তি দেখানো হোক না কেন খ্রিষ্টধর্মের যাথার্থ্য বা ঈশ্বরের অস্তিত্ব কখনো প্রমাণ করা যাবে না; আসলে খ্রিষ্টধর্ম বা ঈশ্বর কোনো যুক্তিসিদ্ধ বিষয় নয়।* অর্থাৎ ধর্ম কিংবা শাশ্বত সত্য (কিয়ের্কেগার্ডের দর্শনে খ্রিষ্টধর্ম, ঈশ্বর ও শাশ্বত সত্য এক ও অভিন্ন) বিষয়গত সত্য নয়, এগুলো হচ্ছে বিষয়ীগত সত্য। এদেরকে জ্ঞান বা বুদ্ধি দিয়ে জানা যাবে না, কেবল উপলব্ধি করতে হবে। খ্রিষ্টধর্ম ও ঈশ্বর প্রসঙ্গে কিয়ের্কেগার্ড আবারও দ্ব্যর্থহীনভাবে উচ্চারণ করেন যে বিষয়গত সত্য আসল সত্য নয়, আসল সত্য নিহিত থাকে বিষয়ীগততায়।

> ... খ্রিষ্টধর্ম সব ধরনের বিষয়গততার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে; এর যে বিষয়ী আছে সে নিজে নিজের সঙ্গে অনন্ত সম্পর্কে সম্পর্কিত। সে সবসময়ই

---

* সোকি সম্ভবত ব্রিটিশ অভিজ্ঞতাবাদী দার্শনিক ডেভিড হিউম (১৭১১-১৭৭৬) দ্বারা প্রভাবিত হয়েছেন। তিনি মনে করতেন শুধু ঈশ্বর কিংবা ধর্ম নয়, জগতের প্রকৃতি, উদ্দেশ্য বা পরিকল্পনা ইত্যাদি কোনো কিছুই প্রজ্ঞা দ্বারা অনুধাবন করা সম্ভব নয়। এ সম্পর্কে তিনি বলেছেন, "These ultimate springs and principles are totally shut up from human curiosity and inquiry."

বিষয়ীগততাকে জানতে চায়; খ্রিষ্টধর্মে যদি কোনো সত্য থাকে তো তা এখানেই নিহিত আছে। বিষয়গতভাবে এর কিছু নেই।[৪]*

"আমিই সত্য" অধ্যায়ে আমরা বিষয়গত ও বিষয়ীগত সত্য সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম। আমরা দেখেছিলাম যে, আমরা যখন বিষয়গত সত্য সম্পর্কে ভাবি তখন নিজেকে বাদ দিয়ে ভাবি এবং বিষয়ীগত সত্য সম্পর্কে ভাববার সময় আসলে আমরা কোনো বিষয় (বা একাধিক বিষয়)-এর সঙ্গে আমাদের নিজেদের ব্যক্তিগত সম্পর্ক নিয়ে ভাবি। যে সত্য বিষয়গতভাবে লাভ করা যায় তা সবসময় বিষয়ীগতভাবে উপলব্ধি করা যায় না। আবার বিষয়ীগত সত্য বিষয়গতভাবে মিথ্যা বা প্যারাডক্স মনে হতে পারে। তবে সোকির মতে বিষয়ীগতভাবে বা ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে কোনো বিষয় সত্য প্রতিভাত হলেই তা সত্য, বিষয়গতভাবে তাকে অযৌক্তিক বা ভ্রান্ত মনে হলেও কিছু যায় আসে না। এখানেও আমরা দেখলাম, বিষয়গতভাবে অর্থাৎ যুক্তি দিয়ে খ্রিষ্টধর্মের যাথার্থ্য কিংবা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ সম্ভব নয়। অর্থাৎ আমার কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করে যদি আমি ধর্ম বা ঈশ্বরকে বিচার করি, আমি কখনোই ধর্মের যাথার্থ্য কিংবা ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে পারব না। কিন্তু তাতে কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হয় না কারণ বিষয়ীগতভাবে আমি ধর্ম ও ঈশ্বরের অস্তিত্ব অনুভব করি। অর্থাৎ আমার সঙ্গে ধর্ম ও ঈশ্বরের যে ব্যক্তিগত সম্পর্ক আছে, সেই সম্পর্কের মাঝে আমি তাদেরকে খুঁজে পাই।

এ কারণেই ধর্মীয় কিংবা ঈশ্বর সম্পর্কিত সত্য জানার জন্য জ্ঞান বা বুদ্ধির প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন বিশ্বাস ও উপলব্ধি। সোকির মতে, আমরা কী জানি তা (অর্থাৎ what) গুরুত্বপূর্ণ নয়, আমাদের ভেতর কীভাবে প্রতিক্রিয়া হয় তা-ই (অর্থাৎ how) বিবেচ্য বিষয়†। কারণ কিয়ের্কেগার্ডের উদ্দেশ্য কোনো বাস্তব জ্ঞান নয়, তাঁর লক্ষ্য হচ্ছে নিজেকে এবং মানবীয় অস্তিত্বকে আরো ভালোভাবে অনুধাবন করা।[৫]

কিন্তু এই যে ঈশ্বর ও খ্রিষ্টধর্ম—যাদের অস্তিত্বের কোনো সাক্ষ্য নেই, প্রমাণ নেই, যাদেরকে কোনো যুক্তি দিয়ে, বুদ্ধি দিয়ে বা জ্ঞান দিয়ে প্রমাণ করা যায় না, তাদেরকে আমি কীভাবে বিশ্বাস করব? শুধু আমার কাছে সত্য মনে হলেই যে তারা সত্য হবে তার তো কোনো নিশ্চয়তা নেই। এই অনিশ্চয়তার কথা স্বীকার করে নেন কিয়ের্কেগার্ড। এ কারণেই, আমরা দেখেছি, তিনি অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে নিঃসীম শূন্যতায় অতলান্ত গহ্বরে লাফ দেওয়ার ঝুঁকি নিতে বলেছেন। তিনি বলেছেন যে লাফ দেওয়ার আগে আমি কখনোই জানতে পারব না যে কাজটি আমি ভুল করছি, না ঠিক করছি। আমাকে অনিশ্চয়তায় ভুগতেই হবে। অতলান্ত গহ্বরের কিনারায় দাঁড়িয়ে আতঙ্কে কাঁপতে কাঁপতে সম্পূর্ণ অনিশ্চিত অবস্থায় আমাকে লাফ দেওয়ার ঝুঁকি নিতে হবে।

এ প্রসঙ্গে তিনি তাঁর প্রিয় দার্শনিক সক্রেটিসের উদাহরণ দিয়েছেন। সক্রেটিস আগে অমরত্বের প্রমাণ সংগ্রহ করে তারপর সেই মানসিক শক্তিতে লড়াই করেন নি। বরং উল্টোটাই ঘটেছে। তিনি তাঁর বিশ্বাসের ওপর নিজের জীবন বাজি রেখেছেন, তারপর নিজের

---

* একজন মানুষের মোক্ষলাভের উৎস হিসেবে ক্রিশ্চিয়ানিটি যেন শুধু তার জন্যই অস্তিত্বশীল যার জন্য সে সত্য সংরক্ষণ করছে; তা না হলে এটাকে সাধারণভাবে গুরুত্বপূর্ণ একটি ঐতিহাসিক ঘটনা ছাড়া আর কিছু ভাবা যায় না।[৬]

† "কী বলা হয়েছে তা নয় বরং কীভাবে বলা হয়েছে সেটাই জীবনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যেমন 'কী' (what) সম্পর্কে সম্ভবত ইতিমধ্যেই বহুবার বলা হয়ে গেছে এবং তাই পূর্বে কথিত বক্তব্যটি সত্য; সূর্যের নিচে কোনোকিছুই নতুন নয়, যে পুরোনো কথা সবসময়ই নতুন..."[৭]

জীবন দিয়ে সেই বিশ্বাসকে প্রমাণ করেছেন। কিয়ের্কেগার্ডের কাছে এটাই আদর্শ জীবন (life of the spirit)। তিনি ঝুঁকিবিহীন আপাদমস্তক নিশ্চিত জীবনকে পছন্দ করতেন না। তাঁর কাছে ওই ধরনের জীবনকে "কাপুরুষোচিত, মেয়েলি" জীবন মনে হত। তিনি মনে করতেন, ওই রকম জীবন হচ্ছে দুই হাত এমনকি দশ হাত ঘুরে আসা জীবন।[৮] লেসিং বলেছিলেন ঐতিহাসিক কোনো ঘটনা বা বিষয়ের ওপর নির্ভর করে কেউ শাশ্বত সুখ পেতে পারে না।[৯] কিয়ের্কেগার্ডও বলেছেন যে ঐতিহাসিক গবেষণার ফলাফলগুলো সবসময়ই অনিশ্চিত এবং এ কারণে খ্রিষ্টধর্মের ঐতিহাসিক সত্যতা আমাকে সাহায্য করতে পারে না। খ্রিষ্টধর্মের ঐতিহাসিক সত্যতা ধরে এগোতে চাইলে আমি কোথাও পৌঁছাতে পারব না। আমার জন্য প্রয়োজন হচ্ছে বিষয়ীগত পছন্দ, বিশ্বাসের ডানায় ভর করে অজানার উদ্দেশে ঝাঁপ দেওয়া এবং চোখ বন্ধ করে উদ্ভট বিষয়কে আঁকড়ে ধরা। অর্থাৎ সক্রেটিস যেভাবে এগিয়েছিলেন আমাকে সেই একই ধরনের পথ ধরে এগোতে হবে।

> এবং তাই আমি নিজেকে বলি : আমি পছন্দ করি; সেই ঐতিহাসিক সত্য আমার জন্য এত কিছু যে আমি আমার পুরো জীবনকে সেই 'যদি'র ওপর বাজি রাখার সিদ্ধান্ত নিই*। তারপর সে বাঁচে; আইডিয়ার ওপর পুরোপুরি নির্ভর করে সে বাঁচে, এজন্য সে তাঁর জীবনের ঝুঁকি নেয়; এবং তাঁর বিশ্বাসের প্রমাণ হচ্ছে তাঁর নিজের জীবন। তিনি প্রথমে কিছু প্রমাণ সংগ্রহ করে তাঁরপর তা বিশ্বাস করেন নি এবং তারপর সেই অনুযায়ী জীবন যাপন করেন নি। বরং পুরো উল্টো দিক থেকে তাঁর যাত্রা শুরু করেছেন।
>
> একেই বলে ঝুঁকি নেওয়া; এবং ঝুঁকি ছাড়া বিশ্বাস একটি অসম্ভব বিষয়ে পরিণত হয়। স্পিরিট (spirit)-এর সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়া মানে একটি পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যাওয়া†; বিশ্বাস করা কিংবা বিশ্বাস করতে চাওয়ার অর্থ হচ্ছে নিজের জীবনকে একটি বিচারের প্রক্রিয়ায় রূপান্তর করা,....[১০]

কিয়ের্কেগার্ডের কথা নাহয় মানা গেল যে আমাকে ঝুঁকি নিতে হবে বা অগ্রপশ্চাৎ না ভেবে অতলান্ত গহ্বরে ঝাঁপ দিতে হবে, কিন্তু সবার আগে তো আমার মনের ভেতর এই ঝুঁকি নেওয়ার বা লাফ দেওয়ার ইচ্ছা জাগতে হবে। এই ইচ্ছেটা আসবে কোত্থেকে? আমরা যদি সক্রেটিসকে মেনে নিই তা হলে এক্ষেত্রে সমস্যা থাকে না। কারণ সক্রেটিস বলেছিলেন যে, সত্য বাহির থেকে আসে না, সত্য পূর্ব থেকেই প্রত্যেক মানুষের মধ্যে বিদ্যমান থাকে। তাঁর মতে, আমরা যখন শিক্ষাগ্রহণ করি তখন বাইরের কিছু শিখি না,

---

* যিশুখ্রিষ্টের কথাতেও একই বিষয় পরিলক্ষিত হয় : যদি কেউ আমার শিক্ষাকে অনুসরণ করে অর্থাৎ আমার শিক্ষানুসারে জীবন যাপন করে অর্থাৎ আমার শিক্ষানুসারে কাজ করে, সে এইসব দেখবে। তার অর্থ হচ্ছে আগেভাগে কোনোকিছুর প্রমাণ পাওয়া যাবে না। তিনি এটাও চান না যে তাঁর অনুসারীরা আগেভাগে নিশ্চিত হয়ে তারপর তাকে অনুসরণ করুক।

† এর কারণ, মানুষ আর কিছুই নয় তার শরীর-আত্মা ও স্পিরিট (spirit)-এর সংশ্লেষণ। কিন্তু "স্পিরিট" তীব্র বিরোধের বীজ বপন করে, অপরদিকে মেয়েলি মানুষরা সবসময় প্রত্যেক সম্পর্কের মধ্যে যা নিম্নতর তাকেই অন্তর্ভুক্ত করতে চায় এবং তার সম্মতি পেতে চায়। এ কারণেই ঝুঁকি নেওয়ার ক্ষেত্রে উদ্বেগের প্রশ্ন আসে। যে মানুষের মধ্যে স্পিরিট নেই সে সবসময় 'সম্ভাবনা'র আকাঙ্ক্ষা করে। কিন্তু স্পিরিট কখনো এই সম্ভাবনাকে প্রদান করে না, কারণ স্পিরিট হচ্ছে পরীক্ষা : আপনি কি সম্ভাবনাকে এড়িয়ে যেতে চান, আপনি কি নিজেকে প্রত্যাখ্যান করতে চান, আপনি কি জগৎ ও অন্যান্য বিষয়কে ত্যাগ করতে চান।[১১]

কেবল স্মৃতিচারণ করে আমাদের ভেতরের ঘুমন্ত বিষয়গুলোকেই জাগিয়ে তুলি। শিক্ষক আমাদেরকে জ্ঞান দান করেন না বরং স্মৃতির আড়ালে ঢেকে-থাকা বিষয়গুলো উন্মোচনে সাহায্য করেন। এ কারণেই সক্রেটিস নিজেকে একজন ধাত্রীর সঙ্গে তুলনা করেছেন।[১২] ধাত্রী যেমন গর্ভস্থ সন্তানকে বেরিয়ে আসতে সাহায্য করে, তেমনি তিনি মানুষের ভেতর সুপ্ত জ্ঞান বা ইচ্ছাকে জাগ্রত করতে সহায়তা করতেন। যাই হোক, সক্রেটিসের কথা মেনে নিলে আমরা বলতে পারি, ঝুঁকি নেওয়া কিংবা লাফ দেওয়ার ইচ্ছা তো আমার ভেতরেই সুপ্ত আছে। আমি ইচ্ছে করলেই তো সে ইচ্ছে করতে পারি। কিন্তু সমস্যা হল কিয়ের্কেগার্ড অনেক ক্ষেত্রে সক্রেটিসকে গুরু মানলেও এ ক্ষেত্রে, হয়তো খ্রিস্টান হওয়ার কারণেই, তাঁকে অনুসরণ করেন নি। খ্রিস্টান মতাদর্শের সঙ্গে তাল মিলিয়ে তিনিও বলেছেন, ইচ্ছে করলেই ইচ্ছে করা যায় না।* খ্রিস্টধর্ম মতে সত্য কোনো ব্যক্তির অধিকারভুক্ত নয়।† ঐশ্বরিক সত্য স্মৃতির বিষয় নয়, ঈশ্বর নিজে তা অভিনবরূপে মানুষকে প্রদান করেন। এই সত্য প্রদান করার জন্য ঈশ্বরকে যিশুখ্রিস্ট রূপে স্বর্গ থেকে মর্ত্যে আগমন করতে হয়েছে। সক্রেটিসের মতানুযায়ী মানুষের মনেই সত্য অবস্থান করে, কিন্তু খ্রিস্টধর্ম ও কিয়ের্কেগার্ডের ব্যাখ্যানুযায়ী শিক্ষালাভ করার পূর্বমুহূর্ত পর্যন্ত মানুষ সত্যবর্জিত অবস্থায় থাকে।[১৩]

আমরা যদি সক্রেটিসের কথা অনুযায়ী ধরে নিই যে সত্য সুপ্ত আকারে সবসময়ই মানুষের মনে অবস্থান করে, তা হলে যিশুখ্রিস্টরূপে ঈশ্বরের মর্ত্যে আগমনের ক্ষণটি শুধুমাত্র একটা উপলক্ষে পরিণত হয়।

কিয়ের্কেগার্ড বলেন, সত্যবর্জিত মানুষ নিজের চেষ্টায় সত্য অর্জন করতে পারে না, তার জন্য শিক্ষক প্রয়োজন। শিক্ষক নিজেই তার কাছে সত্যকে নিয়ে আসবেন, উপরন্তু সত্যকে বোঝার জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতিও তিনি সৃষ্টি করবেন। ফলে বোঝাই যাচ্ছে, কোনো সাধারণ শিক্ষক নয়, একমাত্র ঈশ্বরই এ ধরনের দায়িত্ব পালন করতে পারেন।[১৪]

তা হলে শুধু ইচ্ছা করলেই আমি খ্রিস্টধর্মের অযৌক্তিক ও অলৌকিক ঘটনাসমূহকে বিশ্বাস করতে পারব না। ঈশ্বর নিজে যদি আমাকে সত্য প্রদান না করেন তা হলে শত চেষ্টা করেও আমার পক্ষে শাশ্বত সত্য লাভ করা সম্ভব নয়।

কিন্তু তাই বলে কিয়ের্কেগার্ড বসে থাকেন নি। তিনি অন্যদেরকে খ্রিস্টান করার চেষ্টা করেছেন। যারা খ্রিস্টান নয় অথচ নিজেদের খ্রিস্টান মনে করে, তাদেরকে খ্রিস্টান বানাতে

---

* এ প্রসঙ্গে শোপেনহাওয়ারের বক্তব্য স্মর্তব্য। তিনি বলেছেন, মানুষ ইচ্ছে করলে অনেক কিছু করতে পারে কিন্তু সে ইচ্ছে করলেই ইচ্ছে করতে পারে না।

† ফরাসি প্রোটেস্ট্যান্ট ধর্মতাত্ত্বিক জঁ কালভ্যাঁ'র (১৫০৯-১৫৬৪) ধর্মীয় মতবাদ ক্যালভিনিজম (Calvinism)-এ বিশ্বাসী John Bunyan তাঁর বিখ্যাত allegory *The Pilgrim's Progress*-এ ঠিক একই বিষয় তুলে ধরেছেন। Allegory-র নায়ক Christian যখন তার বন্ধুবান্ধব কিংবা তার নিজের স্ত্রী-পুত্রদের এই বলে সতর্ক করার চেষ্টা করে যে অদূর ভবিষ্যতেই স্বর্গীয় আগুন এসে ছারখার করে দেবে তাদের শহর (City of Destruction)—কেউ বিশ্বাস করে না তাকে। Christian ঈশ্বরের নির্বাচিত ব্যক্তি, তাই একমাত্র সে-ই নিদারুণ সত্যকে উপলব্ধি করে এবং নিজ শহর থেকে পালিয়ে গিয়ে স্বর্গে (Celestial City) যাওয়ার উপায় খোঁজে। কিন্তু ঈশ্বর সাহায্য না করলে তাও সম্ভব নয়। শেষ পর্যন্ত ঈশ্বরপ্রেরিত দূত Evangelist পথ বাতলে দিয়ে, বিভিন্ন রকম বিপদ থেকে উদ্ধার করে তাকে স্বর্গে পৌঁছে দেয়। ঈশ্বরের করুণা বর্ষিত হয় বলেই Christian সত্য উপলব্ধি করে, ঈশ্বর সাহায্য করেন বলেই Christian একজন সত্যিকারের খ্রিস্টান হয়ে উঠতে পারে।

চেয়েছেন। কিয়ের্কেগার্ডের অস্তিত্ববাদী দর্শনের প্রধান লক্ষ্যই হল কীভাবে একজন আদর্শ খ্রিষ্টান হওয়া যায় তা আলোচনা করা। তিনি তাঁর সমস্ত লেখা একজন আদর্শ খ্রিষ্টানের উদ্দেশে উৎসর্গ করেছেন। একজন খ্রিষ্টান হিসেবে তিনিও মনে করতেন যে আমরা সবাই এ্যাডামের বংশধর এবং এ কারণে ঈশ্বরের আদেশ অমান্য করে এডেনের (Eden) নিষিদ্ধ ফল খেয়ে এ্যাডাম যে পাপ করেছিলেন আমরাও সে পাপের ভাগীদার, আমরাও পাপী। আমরা যদি এই পাপ মোচন করতে চাই তা হলে ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে, তাঁর কাছে নিঃশর্তে ও নিঃশেষে আত্মসমর্পণ করতে হবে; অর্থাৎ আমাদেরকে আদর্শ খ্রিষ্টান হতে হবে এবং যিশু-নির্দেশিত পথ অনুসরণ করতে হবে। কিয়ের্কেগার্ডের কাছে খ্রিষ্টধর্ম এতই মহান ছিল যে তিনি এমনকি এও বলেছেন : যে খ্রিষ্টান নয় এবং ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে সক্ষম নয়, সে প্রকৃত মানুষও নয়, তার বেঁচে থাকা অর্থহীন। যে প্রকৃত খ্রিষ্টান নয়, সে পাপী এবং যতদিন সে খ্রিষ্টান হবে না, সে পাপীই থেকে যাবে।[১৫]

কিয়ের্কেগার্ড যা কিছু লিখেছেন ক্রিশ্চিয়ানিটি নিয়েই লিখেছেন। তাঁর সব লেখা যেন খ্রিষ্টধর্মের উদ্দেশ্যেই নিবেদিত। তাঁর মৃত্যুর পর প্রকাশিত বই *The Point of View for my work as an Author*—এর ভূমিকায় তিনি লিখেছেন, "একজন লেখক হিসেবে আমি আসলে বর্তমানে এবং সবসময়ই একজন ধর্মীয় লেখক ছিলাম, একজন লেখক হিসেবে আমার সমস্ত কাজই ক্রিশ্চিয়ানিটির সঙ্গে সম্পর্কিত, কীভাবে একজন খ্রিষ্টান হওয়া যায়, সেই সমস্যার সঙ্গে সম্পর্কিত.....।"[১৬] খ্রিষ্টধর্ম সম্পর্কে যে একটা কিম্ভূত বিভ্রান্তি প্রচলিত আছে কিয়ের্কেগার্ড সেই বিভ্রান্তিকে ভাঙতে চেয়েছিলেন। যেসব পাঠক নিজেদের খ্রিষ্টান মনে করেন তিনি তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করেছিলেন যে তাঁরা প্রকৃত খ্রিষ্টান নন।

কিন্তু সমস্যা হচ্ছে কারো পক্ষে তো কোনো লেখা পড়ে এবং তদ্দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে খ্রিষ্টান হওয়া সম্ভব নয়। কারো সামনে বিশ্বাসের সত্যকে প্রকাশ করলেই যে সে একজন বিশ্বাসী হয়ে উঠবে তা-ও নয়; বিশ্বাস এমন কিছু মতের সমষ্টি নয় যার সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা যায়। ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ পেলেই কেউ ঈশ্বরে বিশ্বাসী হয়ে উঠবে না। বিশ্বাস কোনো জ্ঞান বা অন্তর্দৃষ্টির বিষয় নয়, এটা একজন মানুষের প্রবণতা বা দৃষ্টিভঙ্গি। যেমন আমি হয়তো আপনার অস্তিত্ব স্বীকার করে নিতে পারি, কিন্তু তার মানে এই নয় যে, আপনার ওপর আমি আস্থাবান; তার মানে এই নয় যে, আপনাকে আমি বিশ্বাস করি। ঈশ্বরে বিশ্বাস করা মানে তাঁর সঙ্গে এমন একটি বিশেষ সম্পর্ক স্থাপন করা যেখানে তাঁর ওপর আমার অনপেক্ষ আস্থা থাকবে; তা না হলে 'ঈশ্বর' শব্দটির আর কোনো ধর্মীয় অর্থ থাকে না। ঈশ্বরের অস্তিত্বকে মেনে নেওয়ার অর্থ তাঁকে বিশ্বাস করা নয়। কারণ তাঁকে বিশ্বাস না করেও কেবল দার্শনিক ও বুদ্ধিবৃত্তিক অবস্থানের কারণে আমি তাঁর অস্তিত্ব স্বীকার করতে পারি।

কিয়ের্কেগার্ডের মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছিল যে যদিও তাঁর সমসাময়িকরা সবাই নিজেদেরকে সম্মানিত খ্রিষ্টান ভাবছে আসলে তাদের কেউই প্রকৃত খ্রিষ্টান নয়। "সেই খ্রিষ্টানজগৎ হচ্ছে একটি কিম্ভূত বিভ্রান্তি"— নামক একটি লেখায় তিনি লিখেছেন:

> যার কিছু পর্যবেক্ষণক্ষমতা আছে, যাকে খ্রিষ্টানজগৎ বলে তা নিয়ে যদি কেউ আন্তরিকভাবে চিন্তা করে, অথবা তথাকথিত কোনো খ্রিষ্টান দেশকে নিয়ে যদি কেউ ভাবে, সে নিশ্চয়ই গভীর সংশয়ে জর্জরিত হবে। এই যে হাজার হাজার মানুষ নিজেদেরকে অবলীলায় খ্রিষ্টান বলে পরিচয় দিচ্ছে, এর অর্থ কী? এই যে অনেক অনেক মানুষ—এদের বেশিরভাগই সম্পূর্ণ ভিন্ন ক্যাটাগরির জীবন যাপন

করে...। সম্ভবত এসব মানুষ কখনো চার্চে যায় নি, কখনো ঈশ্বর সম্পর্কে চিন্তা করে নি, শপথ নেওয়ার সময় ব্যতীত অন্য কোনো সময় তাঁর [ঈশ্বরের] নাম উচ্চারণ করে নি। এরা হচ্ছে সেই ধরনের মানুষ যাদের কাছে কখনো মনে হয় নি যে ঈশ্বরের কাছে তাদের কোনো বাধ্যবাধকতা আছে, তারা ক্রিমিনাল আইনের ফাঁক গলে বেরিয়ে গিয়ে নিরপরাধ থাকাকেই যথেষ্ট মনে করে, অথবা এরও খুব একটা প্রয়োজন আছে বলে বোধ করে না। তবুও এইসব মানুষ, এমনকি যারা বেশ জোর দিয়ে ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করে, তারা সবাই খ্রিস্টান, তারা নিজেদেরকে খ্রিস্টান বলে, রাষ্ট্র তাদেরকে খ্রিস্টান বলে স্বীকৃতি দেয়, চার্চ তাদেরকে খ্রিস্টান হিসেবে কবর দেয় এবং তারা যে অনন্তকাল ধরে খ্রিস্টান থাকবে এরকম প্রত্যয়ন করে। এখানে যে একটা কিম্ভূত গোলমেলে ব্যাপার আছে, একটা ভয়ানক বিভ্রান্তি আছে, তাতে কোনো সন্দেহ নেই।[১৭]

কিয়েৰ্কেগার্ডের লক্ষ্য ছিল 'খাঁটি' ও সম্মানিত খ্রিস্টানদের আক্রমণ করা ও আঘাত করা, যাতে তারা বুঝতে পারে যে তারা আসলে কী এবং যাকে খ্রিস্টীয় বিশ্বাস বলে তার অর্থ কী। তিনি এ ধরনের লোককে 'ফিলিস্তিন' [Spidsborgers] আখ্যা দিয়েছিলেন। একজন ফিলিস্তিনের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সে সব সময় অসচেতনভাবে সমাজের মূল্যবোধ ও সংস্কারকে বহন করে অর্থাৎ বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে স্রোতে গা ভাসিয়ে দেয়। একজন ফিলিস্তিন সাধারণভাবে গৃহীত রীতিনীতি ও আদর্শকে আঁকড়ে ধরে। এবং যেহেতু সমাজের 'অচলায়তন'-কে ভাঙার কোনো আর্তি অনুভব করে না তাই সে তার পেশা ও পরিবার কিংবা সাফল্য ও সুখের গণ্ডিতেই তৃপ্ত থাকে। অবশ্য তার নিজের ধারণা যে সে স্বাধীন জীবন যাপন করে, নিজের সিদ্ধান্ত নিজে নেওয়ার ক্ষমতা ভোগ করে এবং তার নিজস্ব পছন্দ-অপছন্দ বলে একটা ব্যাপার আছে। তার ধারণা যে খুব অযৌক্তিক তা নয়, কারণ আপাতদৃষ্টিতে দেখলে তো মনেই হয়, সে অনেক বিকল্প বিষয় থেকে একটাকে বেছে নেয় কিংবা নিজের খেয়ালখুশিমতো জীবন যাপন করে। কিন্তু তলিয়ে দেখলে বোঝা যাবে যে, সে নয়, তার পছন্দ-অপছন্দ কিংবা সিদ্ধান্তসমূহের নির্ধারক হচ্ছে সামাজিক ও ঐতিহাসিক শক্তিসমূহ। অধ্যাপক ইওহানেস স্লক (Johannes Sløk) তাঁর *Kierkegaards Univers* বইতে মন্তব্য করেছেন : "একজন ফিলিস্তিন এই ভেবে তার জীবন পার করে দেয় যে সে তার সমস্ত সিদ্ধান্তগুলো স্বাধীনভাবে গ্রহণ করেছে, কিন্তু আসলে কিছু নাম-না-জানা শক্তি তাকে দিয়ে কাজগুলো করিয়ে নেয়।"[১৮] তার জীবন যে অন্য কিছু দ্বারা শাসিত হচ্ছে এটা একজন ফিলিস্তিন বুঝতে পারে না।

কিয়েৰ্কেগার্ডের উদ্দেশ্য ছিল একজন লেখক হিসেবে তিনি ফিলিস্তিনদের জাগিয়ে তুলবেন, তাদের আত্মিক অবস্থা সম্পর্কে তাদেরকে সচেতন করবেন। এ ধরনের কাজ, অর্থাৎ একজন মানুষ যে নিজেকে খ্রিস্টান মনে করে নিশ্চিত হয়ে বসে আছে, তাকে তার ভুল ভেঙে দিয়ে আবার সত্যিকারের খ্রিস্টান হতে উদ্বুদ্ধ করা যে কত কঠিন তা তিনি ভালোভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন।

> একজন মানুষকে কোনো আইডিয়া বা প্রত্যয় কিংবা কোনো বিশ্বাসকে গ্রহণ করতে বাধ্য করা এমনই কঠিন যে আমার পক্ষে তা কোনোভাবেই করা সম্ভব নয়, কিন্তু একটি কাজ আমি করতে পারি...আমি তাকে [বিষয়টি] লক্ষ করতে বাধ্য করতে পারি।
>
> এটি যে একটি ভালো কাজ তাতে কোনো সন্দেহ নেই, কিন্তু এটা ভুলে গেলে

চলবে না যে একজন মানুষকে [বিষয়টি] লক্ষ করতে বাধ্য করে আমি তাকে মূল্যায়ন করতেও বাধ্য করব। এখন সে মূল্যায়ন করবে। কিন্তু সে কী সিদ্ধান্ত নেবে তা আমি নির্ধারণ করতে পারব না। সম্ভবত আমি যা চাই সে একেবারে তার বিপরীত সিদ্ধান্ত নেবে। উপরন্তু মূল্যায়ন করতে বাধ্য হওয়ার কারণে তার মনের ভেতর হয়তো আমার সম্পর্কে এবং সেই কারণ সম্পর্কে সাঙ্ঘাতিক তিক্ত অনুভূতির জন্ম নেবে। এবং সম্ভবত আমি নিজেই নিজের জুয়া খেলার শিকার হব।[১৯]

একজন ফিলিস্তিন যেন লক্ষ করতে বাধ্য হয়, এ কারণে তার অসচেতন পূর্ব-ধারণাগুলো সম্পর্কে এবং সে যে তার সমাজের মূল্যবোধ ও পক্ষপাতিত্বের ওপর পুরোপুরি নির্ভরশীল এই বিষয়ে তাকে সচেতন করতে হবে। এরকম একটি বিভ্রমকে কীভাবে দূর করা যাবে? কিয়ের্কেগার্ডের মতে একে সরাসরি দূর করা যাবে না। "প্রত্যেকেই যে খ্রিস্টান এই বিশ্বাস যদি একটি বিভ্রম হয় এবং এ সম্পর্কে যদি কিছু করতে হয়, তা হলে সেই কাজ অবশ্যই পরোক্ষভাবে করতে হবে....।"[২০] অর্থাৎ নিজেকে একজন আদর্শ খ্রিস্টান হিসেবে দাবি করে এগোলে কোনো লাভ হবে না, বরঞ্চ এক্ষেত্রে নিজেকে পুরোপুরি অখ্রিস্টান ঘোষণা করাই ভালো। এইসব বিষয় চিন্তা করেই কিয়ের্কেগার্ড তার বইগুলো ছদ্মনামে ছেপেছেন এবং সরাসরি খ্রিস্টীয় বিষয় নিয়ে আলোচনা না করে aesthetics* নিয়ে আলোচনা করেছেন। তিনি বিশ্বাস করতেন তথাকথিত খ্রিস্টানরা যে জায়গায় আছে, সেই অবস্থান থেকে ডাক দিলেই বেশি সাড়া পাওয়া যাবে। তিনি উপলব্ধি করেছিলেন ফিলিস্তিনদেরকে অস্তিত্বের স্বরূপ উন্মোচনে সাহায্য করতে চাইলে, তাদের ভাষায় কথা বলতে হবে, তাদের সঙ্গে মিশে যেতে হবে। এ কারণেই তিনি তাঁর aesthetical লেখাগুলো লিখেছিলেন। পরবর্তী অধ্যায়ে আমরা সেদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করব।

---

* Aesthetics শব্দটি ইংরেজিতে যেভাবে ব্যবহৃত হয় কিয়ের্কেগার্ড সেভাবে ব্যবহার করেন নি। Gyldendal তাঁর *Dictionary of the Danish Language* [Ordbog over det Danske Sprog]- এ শব্দটির প্রচলিত ইংরেজি অর্থ ছাড়াও লিখেছেন, "pertaining to a person's philosophy of life, as this is determined by the fact that the person exclusively or to a great extent values life's various relationships on the basis of their possibility of evoking a strong feeling of pleasure, enjoyment, and the like"[২১] কিয়ের্কেগার্ড 'aesthetical person' বা 'aesthete' বলতে এমন লোককে বুঝিয়েছেন যে সবসময় যা ভালো লাগে, যা তাকে আনন্দ দেয়, যা তাকে একঘেয়েমিজনিত বিরক্তি থেকে মুক্তি প্রদান করে তার পেছনে ছোটে। অর্থাৎ আমাদের মধ্যে যারা সবসময় মজা করে, সুখের পেছনে ছোটে কিংবা একঘেয়েমি থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য ছটফট করে তারাই কিয়ের্কেগার্ডের aesthete। যেহেতু aesthete-এর জুতসই কোনো বাংলা প্রতিশব্দ নেই, তাই পরবর্তী অধ্যায়গুলোতে আমরা সরাসরি 'aesthete' ও 'aesthetical' শব্দগুলো ব্যবহার করব।

তথ্যসূত্র :

১. Kierkegaard, Søren, 1941, *Concluding Unscientific Postscript,* trans. David F. Swenson and Walter Lowrie, Princeton, Princeton University Press, p. 513

২. Ibid., p.189

৩. সঞ্জীব ঘোষ (সম্পা :), ১৯৮৬, *অস্তিবাদ দর্শনে ও সাহিত্যে,* কলকাতা, পৃ: ১৭

৪. Kierkegaard, Søren, 1941, *Concluding Unscientific Postscrcipt,* trans. David F. Swenson and Walter Lowrie, Princeton, Princeton University Press, p.116

৫. Brown, Colin, 1969, *Philosophy and the Christian Faith,* London, Tyndale Press, p.131

৬. Hartshorne, M. Holmes, 1990, *Kierkegaard Godly Deceiver,* New York, Columbia University Press, p.99

৭. *The Journals of* Søren *Kierkegaard,* 1958, selected, ed. and trans. Alexander Dru, Fontana Paperback, p.190

৮. Brown, Colin, 1969, *Philosophy and the Christian Faith,* London, Tyndale Press, p.129

৯. Ibid., p. 129

১০. Ibid.

১১. *The Journals of Søren Kierkegaard,* 1958, selected, ed. and trans. Alexdander Dru, 1958, Fontana Paperback, pp. 185f

১২. নীরুকুমার চাকমা, ১৯৯৭, *অস্তিত্ববাদ ও ব্যক্তিস্বাধীনতা,* ঢাকা, বাংলা একাডেমী, পৃ: ৪২

১৩. Ibid., পৃ: ৪২

১৪. Ibid., পৃ: ৪২

১৫. Ibid., পৃ: ৪১

১৬. Kierkegaard, Søren, 1962, *The Point of View of My work as an Author: A Report to History,* trans. Walter Lowrie. New York: Harper Torchbook, p. 5

১৭. Ibid., p. 22f

১৮. Hartshorne, M. Holmes, 1990, *Kierkegaard Godly Deceiver,* New York, Columbia University Press, p.15

১৯. Kierkegaard, Søren, 1962, *The Point of View of My work as an Author: A Report to History,* trans. Walter Lowrie, New York. Harper Torchbook, p.35

২০. Ibid., p.24

২১. Hartshorne, M. Holmes, 1990, *Kierkegaard Godly Deceiver,* New York, Columbia University Press, p. 5

জীবনের তিনটি স্তর

I came among these hills; when like a roe
I bounded o'er the mountains, by the sides
Of the deep rivers, and the lonely streams,
Wherever nature led—more like a man
Flying from something that he dreads than one
Who sought the thing he loved....
.....
—That time is past,

And all its aching joys are now no more,
And all its dizzy raptures. Not for this
Faint I, nor mourn nor murmur; other gifts
Have followed; for such loss, I would believe,
Abundant recompense. For I have learned
To look on nature, not as in the hour
Of thoughtless youth; but hearing oftentimes
The still, sad music of humanity,
...
—William Wordsworth

কিয়ের্কেগার্ডের মতে, মানবজীবনে মূলত তিনটি স্তর (stage) পরিলক্ষিত হয়। এগুলো হচ্ছে aesthetic (ভোগী), নৈতিক ও ধর্মীয় স্তর। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে ধর্মীয় স্তর সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা হয়েছে। এই অধ্যায়ে আমরা মূলত aesthetic (ভোগী) ও নৈতিক স্তরের ওপর মনোনিবেশ করব।

যে মানুষ এইসব স্তরের কোনোটিতেই উপনীত হয় নি, কিয়ের্কেগার্ডের মতে, সে এখনো ফিলিস্তিন*। কিয়ের্কেগার্ডের দৃষ্টিতে, আমরা প্রায় সবাই ফিলিস্তিন। এখানে উল্লেখ্য, বহু শতাব্দী আগে বিখ্যাত গ্রিক দার্শনিক প্লেটোও প্রায় একইভাবে ভেবেছিলেন। তিনিও তাঁর চারপাশের বেশিরভাগ মানুষকে 'ফিলিস্তিন' মনে করতেন।

---

* মানুষের ফিলিস্তিন অবস্থা সম্পর্কে পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আলোচনা হয়েছে, এবং চলমান অধ্যায়েও এই বিষয়ে আলোচনা হবে।

প্লেটোর *রিপাবলিক (Republic)*-এর ৭ম পুস্তকে (Book-VII) সক্রেটিস (*রিপাবলিক*-এর অন্যতম প্রধান চরিত্র) একটি গুহার রূপক বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন :

> আসুন আমরা কল্পনা করে নিই সমগ্র মানবজাতি বাস করছে মাটির নিচে কোনো এক গুহাতে, গুহাটি শুধু একটি প্রশস্ত প্রবেশপথের মাধ্যমে বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে সংযুক্ত। অনেক নিচে, গুহার তলদেশে মানুষ বন্দি হয়ে আছে, তাদের পা ও কণ্ঠদেশ এমনভাবে শৃঙ্খলিত যে তারা নড়তে-চড়তে পারছে না। তারা কখনোই সূর্যালোক দেখে নি। তাদেরকে রাখা হয়েছে একটি দেয়ালের দিকে মুখ করে। বন্দিদের পেছনে একটি জায়গায় আগুন জ্বলছে। আগুন ও বন্দিদের মাঝখানে উঁচু একটি পথ। সেই পথের ওপর আবার নিচু একটা দেয়াল আছে। পুতুলনাচের আসরে যেমন পুতুল-নাচিয়েদের আড়াল করার জন্য একটি পরদা থাকে, পথের ওপর এই নিচু দেয়ালটির কাজও ঠিক তাই। কারণ ওই পথের ওপর দিয়ে বিভিন্ন ধরনের জিনিসপত্র (মানুষের মূর্তি, পশু-পাখি, গাছ ইত্যাদি) উঁচু করে ধরে যখন কেউ হেঁটে যাবে, বাহক থাকবে দেয়ালের আড়ালে। ওই পথের ওপর দিয়ে সবসময়ই কোনো-না-কোনো জিনিস বয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আর পিছনের আগুনের আলোয় তাদের ছায়া পড়ছে সামনের দেয়ালে। দেয়ালের দিকে মুখ করে থাকা আষ্টেপৃষ্ঠে শৃঙ্খলিত বন্দিরা অবিরাম কেবল দেয়ালে প্রক্ষেপিত ছায়া দেখছে, আর কিছু নয়।[১]

বন্দিরা সবসময় যা দেখছে তা শুধু ছায়া, কায়া নয়; এবং যা শুনছে তা দেয়ালে-দেয়ালে অনুরণিত প্রতিধ্বনি মাত্র, আর কিছু নয়। বন্দিরা কিন্তু তাদের এই পরিচিত ছায়া, আবেগ ও সংস্কারের সঙ্গেই একাত্ম। তারা যদি কখনো ঘাড় ঘুরিয়ে পিছনের জিনিসগুলো দেখার সুযোগ পায় তা হলে আগুনের আলোর উজ্জ্বলতায় তাদের চোখ ঝলসে যাবে; তারা বিরক্ত হবে এবং ভাববে তাদের ছায়াজগৎটাই সত্যি—ওটাই সত্যিকারের বাস্তবতা। কিন্তু বন্দিদের মধ্যে একজন যদি কোনোভাবে মুক্ত হয়ে আগুনের আলোয় তার চারপাশ এবং সাথীদের দেখে এবং তারপর যদি তাকে প্রবেশপথ দিয়ে টেনে ওপরে তুলে পৃথিবীর আসল রূপ দেখানো হয়, তা হলে তার প্রতিক্রিয়া কেমন হবে? পৃথিবীর আসল রূপ প্রত্যক্ষ করার পর গুহার ভেতরের জীবন ও সেখানকার মানুষের বাস্তবতা ও নৈতিকতার ধারণা সম্পর্কে সে কী ভাববে? সে যদি নবলব্ধ উপলব্ধি নিয়ে ফিরে গিয়ে অন্ধকার গুহায় নিয়ত ছায়া-পর্যবেক্ষণরত শৃঙ্খলিত ওইসব মানুষের মনে তা সঞ্চারিত করতে যায়, তা হলে কি সে তাদের ঠাট্টা, বিদ্রূপ ও শারীরিক আক্রমণের শিকার হবে না?[২]

কিয়ের্কেগার্ড নিশ্চিত ছিলেন যে ওইরকম 'আলোক'প্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি যদি অজ্ঞানতার অন্ধকারে নিমজ্জিত মানুষদের হঠাৎ করে জাগাতে যায় সে অবশ্যই আক্রমণের শিকার হবে (কারণ তিনি জানতেন মায়াবদ্ধ অজ্ঞানদের কাছে সত্য উন্মোচন করতে গিয়ে তাঁর প্রিয় দার্শনিক সক্রেটিস কিংবা গালিলেও-ব্রুনো-ভানিনিদের কী পরিণতি হয়েছিল), তার চেয়েও বড় কথা, তিনি মনে করতেন, হঠাৎ করে সত্যের আলোয় চোখ ঝলসে দিলে সাধারণ মানুষরা সঠিক পথে আসতে ভয় পাবে। এ কারণেই অনেক লেখা তিনি সরাসরি নিজের নামে লেখেন নি। তাঁর অনেক বইয়ের ছদ্মনামী লেখকরা পাঠকদেরকে আয়রনির (irony) মাধ্যমে ভুলিয়ে-ভালিয়ে নিয়ে গিয়ে সত্যের সামনে হাজির করেন।*[৩]

---

* M. Holmes Hartshorne তাঁর *Kierkegaard Godly Deceiver* গ্রন্থের মুখবন্ধে লিখেছেন, "Our western history has given us two great ironists : Socrates and Kierkegaard".[৪]

কিয়েৰ্কেগার্ড উপলব্ধি করেছিলেন যে তাঁর চারপাশের লক্ষ-কোটি মানুষরা—যাদের বদ্ধমূল ধারণা যে তারা খ্রিষ্টান, তারা খ্রিষ্টান হিসেবে জন্মেছে, খ্রিষ্টান হিসেবেই মৃত্যুবরণ করবে, এমনকি অনন্তকাল ধরে তাদের সত্তা খ্রিষ্টান পরিচয়েই পরিচিত হবে—আসলে ওই গুহাবাসী "নিয়ত ছায়া-পর্যবেক্ষণরত" মানুষ। তারা জানে না যে তারা খ্রিষ্টান নয়*। পূর্ববর্তী অধ্যায়ে আমরা দেখেছি কিয়েৰ্কেগার্ড এদেরকে 'ফিলিস্তিন' আখ্যা দিয়েছেন এবং আমরা এও জেনেছি যে, সোক্রির অধিকাংশ লেখার মূল উদ্দেশ্য ছিল এইসব 'ফিলিস্তিন'-দের সত্যিকারের ধর্মের পথে নিয়ে আসা। কিন্তু তিনি জানতেন যারা নিজেদের খ্রিষ্টান ভেবে নিশ্চিত হয়ে বসে আছে, তাদেরকে সত্যিকারের খ্রিষ্টান করা কত কঠিন। তিনি ঠিক করলেন যে প্রথমে পাঠকদের সঙ্গে একটা ভালো সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। তিনি তাঁর বই *Point of View*-তে লিখেছেন, "ধর্মীয় লেখককে অবশ্যই যত্ন করে পাঠকের সঙ্গে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তুলতে হবে। অর্থাৎ তাকে অবশ্যই aesthetical লেখা দিয়ে শুরু করতে হবে"।[৫]

কিয়েৰ্কেগার্ডের aesthetical বইগুলো এমনভাবে লেখা যেন একজন 'ফিলিস্তিন' পাঠক সেগুলো পড়তে পড়তে তার জীবনের অসারত্ব উপলব্ধি করতে পারে। অর্থাৎ সে যেন তার পূর্বকল্পনাগুলোকে (presuppositions) লক্ষ করতে বাধ্য হয়। যখন 'ফিলিস্তিন' বুঝতে পারে যে তার মূল্যবোধ, সিদ্ধান্তসমূহ এবং তার জীবনের উদ্দেশ্য—ইত্যাদির পেছনে তার নিজের কোনো ভূমিকা নেই, সবই প্রচলিত সামাজিক কাঠামোসমূহের আপেক্ষিক ও আকস্মিক চরিত্র দ্বারা নির্ধারিত, তার বিভ্রম কেটে যায়। সে সবকিছুর প্রতি নিস্পৃহ হয়ে পড়ে কারণ তার পছন্দ বা সিদ্ধান্তের কোনোটিই চূড়ান্ত অর্থে তার নিজের নয়; কোথাও সে নিজেকে খুঁজে পায় না, সবকিছুকেই তার অর্থহীন মনে হয়। কারণ বাস্তবতায়, এমনকি তার নিজ-স্বভাবের বাস্তবতায়, তার মূল্যবোধ ও কর্তব্যের কোনো অনপেক্ষ মর্যাদা নেই, সবকিছুই অর্থহীন। কোনোকিছুকেই আর গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করা যায় না। "ঠিক যে মুহূর্তে ফিলিস্তিন আবিষ্কার করে যে সে একজন ফিলিস্তিন, এবং তার অর্থ কী, সে সঙ্গে সঙ্গে অন্য কিছুতে পরিবর্তিত হয়। সে একজন aesthete হয়ে যায়।"[৬] এখন সে জানে যে কোনো বিষয়কে ফেলে অন্য আরেকটি বিষয় বেছে নেওয়ার পেছনে কোনো যুক্তি নেই। যখন সে ফিলিস্তিন ছিল, যখন নিজের অবস্থান সম্পর্কে তার কোনো ধারণা ছিল না, তখন তার মনে হত যে নিজের সিদ্ধান্ত সে নিজেই নিচ্ছে; কিন্তু সে আসলে কখনো কোনো সিদ্ধান্ত নেয় নি। সে এখন জানে যে তার পছন্দ এখন যেমন তেমনি সবসময়ই শূন্যগর্ভ ছিল, এবং সবসময়ই তাই থাকবে, কারণ কোনো বিকল্পেরই কোনো স্বকীয় অর্থ নেই : তারা সবই সেই সমাজের আকস্মিকতার ফসল যে সমাজে সে হঠাৎ করে জন্মগ্রহণ করেছে। সে যা করে কিংবা করবে বলে ভাবে সবকিছুর প্রতিই সে সমানভাবে উদাসীন। কিয়েৰ্কেগার্ডের বই *Either/Or*- এর aesthete 'A'-এর কথা লক্ষ করা যাক :

> আমার কিছুই ভালো লাগে না। আমার ঘোড়ায় চড়তে ভালো লাগে না, এতে খুব শক্তি ব্যয় হয়; আমার হাঁটতে ভালো লাগে না, কারণ এটা খুব শ্রমসাধ্য। আমার শুতে ভালো লাগে না, কারণ আমি যদি শুয়েই থাকি, আমার ভালো লাগবে না বা আমি যদি আবার উঠে দাঁড়াই, তাও আমার ভালো লাগবে না। Summa Summarum: আমার কিছুই ভালো লাগে না।[৭]

---

* এ যেন সক্রেটিসের কথার প্রতিধ্বনি। সক্রেটিস বলেছিলেন যে মানুষ জানে না যে সে জানে না।

একজন aesthete-এর কাছে মূল্যবোধসমূহ অপ্রাসঙ্গিক, কারণ তাদের কোনো বিষয়গত (objective) মর্যাদা কিংবা ontological বাস্তবতা নেই। মানুষ যা করে, যাকে সঠিক বলে, কিংবা যাকে কর্তব্য বলে ঘোষণা করে তাই যদি একটি বিষয়কে ছেড়ে অন্য একটি বিষয়কে বেছে নেওয়ার মাপকাঠি হয়, তা হলে মূল্যবোধসমূহের কোনো ভিত্তি নেই; একজন মানুষ হঠাৎ করে যে সমাজে জন্মগ্রহণ করে সেগুলো সেই সমাজের কিছু বিশেষ আকস্মিক বৈশিষ্ট্যের বেশি কিছু নয়। Aesthete বুঝতে পারে যে, মূল্যবোধের বাঁধনে আবদ্ধ থাকাটা একধরনের মূঢ়তা। কেবল আমোদ লাভ কিংবা আকাঙ্ক্ষার চরিতার্থতাই কোনো বিষয়কে পছন্দ করার মাপকাঠি হতে পারে। একজন aesthete সবসময় চরম আনন্দ ভোগ করতে চায় ও একঘেয়েমিকে এড়ানোর চেষ্টা করে, এবং একই সঙ্গে সে যে মুহূর্তে যা ভালো লাগে সেই মুহূর্তে তার পেছনে ছোটে। সে পুরোপুরি স্বেচ্ছাচারী হয়ে ওঠে।

কিয়ের্কেগার্ডের মতে জীবনকে তিন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা যায়। সেই তিন দৃষ্টিভঙ্গির একটি হচ্ছে aesthetic দৃষ্টিভঙ্গি। সোকি ছদ্মনামে যে-সব লেখা লিখেছেন সেখানে এই দৃষ্টিভঙ্গিগুলো স্তর (stage) হিসেবে উল্লিখিত হয়েছে। Aesthete কিছু পরোয়া করে না, কারণ কোনো বিষয়কে গুরুত্বের সঙ্গে গ্রহণ করাটা হাস্যকর। কিছু ছেড়ে অন্যকিছুকে পছন্দ করার কোনো অর্থ নেই। কিয়ের্কেগার্ডের aesthete 'A'-র কথা হচ্ছে :

> যদি বিয়ে করেন, আপনি পস্তাবেন; যদি বিয়ে না করেন তাও আপনি পস্তাবেন; যদি বিয়ে করেন বা না-করেন, উভয়ক্ষেত্রে আপনি পস্তাবেন। জগতের বাতুলতায় যদি হাসি পায়, আপনি পস্তাবেন; যদি কান্না পায় তাও আপনি পস্তাবেন; জগতের বাতুলতা দেখে আপনি হাসুন কিংবা তা দেখে আপনি কাঁদুন, আপনি উভয়ক্ষেত্রে পস্তাবেন; জগতের বাতুলতা দেখে আপনি হাসুন বা কাঁদুন, আপনি উভয়ক্ষেত্রে পস্তাবেন; কোনো নারীকে বিশ্বাস করুন, আপনি পস্তাবেন, তাকে বিশ্বাস না-করলেও আপনি পস্তাবেন; কোনো নারীকে বিশ্বাস করুন অথবা তাকে বিশ্বাস না-করুন, উভয়ক্ষেত্রে আপনি পস্তাবেন; কোনো নারীকে আপনি বিশ্বাস করুন বা না করুন, উভয়ক্ষেত্রে আপনি পস্তাবেন। নিজেকে ফাঁসিতে ঝোলান, আপনি পস্তাবেন; নিজেকে ফাঁসিতে না ঝোলালেও আপনি পস্তাবেন; নিজেকে ফাঁসিতে ঝোলান বা নিজেকে ফাঁসিতে না-ঝোলান, উভয়ক্ষেত্রে আপনি পস্তাবেন; আপনি নিজেকে ফাঁসিতে ঝোলান বা না-ঝোলান, উভয়ক্ষেত্রে আপনি পস্তাবেন। ভদ্রমহোদয়গণ এটাই হচ্ছে সব দর্শনের সার কথা।[৮]

এটা বেশ স্পষ্ট যে, জীবনের প্রতি এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে অযৌক্তিকতা ও নির্লিপ্ততা। এক্ষেত্রে একঘেয়েমিকে এড়িয়ে যাওয়াই বুদ্ধিমানের কাজ, কারণ aesthete 'A'-এর মতে একঘেয়েমিই হচ্ছে সকল নষ্টের গোড়া। সোকি তাঁর *Either/Or*-এর মজার একটি রচনা "The Rotation Method"-এ বিষয়টিকে বিশদভাবে উপস্থাপন করেছেন। লেখাটির অংশবিশেষ লক্ষ করা যাক :

> অভিজ্ঞ মানুষরা বেশ জোর দিয়ে বলেন যে মৌলিক সূত্র থেকে শুরু করাটা খুবই যুক্তিযুক্ত পদ্ধতি। আমি তাঁদেরকে খুশি করতে চাই এবং তাই সব মানুষ যে একঘেয়ে এই সূত্র থেকে শুরু করতে চাই। নাকি এক্ষেত্রে আমার সঙ্গে দ্বিমত করার মতো যথেষ্ট একঘেয়ে কোনো ব্যক্তি আছেন....
>
> একঘেয়েমি হচ্ছে সব নষ্টের গোড়া। এর ইতিহাস খুঁজতে গেলে একেবারে বিশ্বসৃষ্টির গোড়ায় চলে যেতে হবে। দেবতারা একঘেয়েমিতে ভুগছিল, তাই তারা

মানুষ তৈরি করল। একা ছিল বলে এ্যাডামের একঘেয়ে লাগল, তাই ঈভকে সৃষ্টি করা হল। সেই মুহূর্ত থেকে জগতে একঘেয়েমি প্রবেশ করল এবং জনসংখ্যা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তা বাড়তে লাগল। এ্যাডাম একা একঘেয়েমিতে ভুগছিল; তারপর এ্যাডাম ও ঈভ দু জনে মিলে একসঙ্গে একঘেয়েমিতে ভুগল; তারপর এ্যাডাম এবং ঈভ এবং কেইন এবং এ্যাবেল, পুরো পরিবার একসঙ্গে একঘেয়েমিতে ভুগল; তারপর পৃথিবীর জনসংখ্যা বাড়ল এবং সবাই মিলে দলেবলে একঘেয়েমিতে ভুগল। এই একঘেয়েমি কাটানোর জন্য তারা স্বর্গে পৌঁছানোর আশায় স্বর্গ-সমান উঁচু একটি টাওয়ার বানানোর পরিকল্পনা করল। টাওয়ারটা যত উঁচু ছিল এই আইডিয়াটাও ছিল তত একঘেয়ে এবং ফলে শেষ পর্যন্ত কীভাবে একঘেয়েমির জিৎ হয় অবশেষে তার ভয়ঙ্কর প্রমাণ মিলল।[৯]

লেখাটিতে এরকমই সব নৈরাশ্যব্যঞ্জক ও মজার মজার কথা ছড়িয়ে আছে। জগতের বাতুলতা কিংবা যে বাতুলতাকে আমরা জগৎ বলি সেই জগতের মুখোমুখি হয়ে আমরা হাসতেও পারি কাঁদতেও পারি, কিন্তু একটা না করে আরেকটা করব কেন? যদি একটির চেয়ে অপরটি বেশি মজার না হয়, একজন aesthete-এর কাছে এদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই।

আসলে এই aesthete তো সেই ফিলিস্তিন যে এখন বুঝতে পেরেছে যে একঘেয়েমিকে এড়িয়ে যাওয়া ছাড়া তার জীবনের অন্য কিছুর আর কোনো অর্থ নেই। এখন শুধু খাদ্য, পানীয় ও আনন্দ, কারণ আগামী কালই তো আমরা মারা যাব।

এই 'ফিলিস্তিন'-অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার আরেকটি উপায় অবশ্য আছে। সেটা হচ্ছে কর্তব্য, বাধ্যবাধকতা এবং নৈতিকতাকে আবিষ্কার করে তাদের পেছনে লেগে থাকা। সমাজ কর্তৃক নির্ধারিত জীবন যাপন না করে, কেবল প্রচলিত সংস্কৃতির বাহকে পরিণত না হয়ে, একজন নৈতিক ব্যক্তি তার কর্তব্য পালন করে অর্থাৎ যে আদর্শ ও মূল্যবোধকে সে বাস্তব বলে মনে করে তাকে অনুসরণ করে। একজন ফিলিস্তিনের মতো সে পূর্বে 'যা করা হয়েছে' কেবল তাকে অন্ধ অনুসরণ করে সিদ্ধান্ত নেয় না, আবার একজন aesthete-এর মতো তার সিদ্ধান্তগুলো অযৌক্তিক কিংবা ভিত্তিহীন নয়। একজন মানুষের যেভাবে বিশ্বজনীন নৈতিক আইনকে মেনে চলা উচিত, একজন নৈতিক ব্যক্তি ঠিক তাই করে। এ কারণেই তার জীবনের যথার্থতা আছে। সে aesthetical বা ফিলিস্তিন-অস্তিত্বের অযৌক্তিকতা থেকে মুক্ত।

নৈতিকতার পরিপ্রেক্ষিতে একজন ফিলিস্তিনের মতো একজন aesthete-ও হতাশাগ্রস্ত। তার নিজের বলে কিছু নেই, তার সিদ্ধান্তসমূহের কেবল ছায়া আছে, কায়া নেই, তারা যুক্তি-পারম্পর্যহীন। একজন aesthete-এর পছন্দসমূহ তার জীবনে কোনো ভূমিকা রাখে না, তার পছন্দসমূহ তার খেয়ালখুশির প্রতিচ্ছবি মাত্র, অন্য কিছু নয়। যদি এরকম হতাশ কোনো ব্যক্তি নিজের হতাশাকে বেছে নেয়, অর্থাৎ তার জীবন যে অযৌক্তিক এবং এ কারণেই যে সে হতাশ সে যদি এই সত্যকে মেনে নেওয়ার সাহস করে, সে যদি তার হতাশ জীবনকে নিজের বলে গ্রহণ করে এবং তার দায়দায়িত্ব কাঁধে তুলে নেয়, তা হলে সে নিজেকে বেছে নেয়, এবং এটাই তার নৈতিকতা। সে নিজেকে এমন এক ব্যক্তি হিসেবে স্বীকার করে নিয়েছে যে হতাশ হয়। এরকম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে সে হতাশাকে অতিক্রম করে যায়। এখন তার জীবন নির্ধারণ করে অন্য একটি বিষয় : শুভ ও অশুভ। এখন either/or অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। এখন পছন্দ অনেক কিছু পাল্টে দিতে পারে।

কিয়েৰ্কেগার্ডের লেখায় এরকম একজন আদর্শ নৈতিক মানুষ হচ্ছেন জাজ উইলিয়াম (Judge William)। *Either/ Or*- এর দ্বিতীয় ভল্যুমে তিনি তাঁর তরুণ বন্ধু প্রথম ভল্যুমের aesthete 'A'-কে কিছু একঘেয়ে চিঠি লেখেন। তিনি 'A'-কে এমনভাবে বোঝানোর চেষ্টা করেন যাতে সে হতাশাকে বেছে নেয় অর্থাৎ সে যেন তার নিজের হতাশার দায়দায়িত্ব নিজের কাঁধে নেয় এবং এভাবে "তার শাশ্বত বৈধতায়" নিজেকে বেছে নেয়।

'শাশ্বত বৈধতা'-র মতো এমন একটি গুরুগম্ভীর শব্দবন্ধের অর্থ কী? যখন কেউ নিজের শাশ্বত বৈধতায় নিজেকে বেছে নেয় তখন সে, যে-সব বিষয়কে অবশ্যই সকল মানুষের জন্য বৈধ নিয়মাত্মক বলে মনে হয়, সে-সব বিষয় দ্বারা সংজ্ঞায়িত একটি অস্তিত্বকে বেছে নেয়। সে তখন ওই শাশ্বত সূত্রসমূহ আশ্রয় করে এবং সেই অনপেক্ষ আইনকে অনুসরণ করে বাঁচার সিদ্ধান্ত নেয়। যেমন, যে আইনটি একজন ব্যক্তিমানুষকে, সে নিজেকে যেমনভাবে ভালবাসে ঠিক তেমনিভাবে, তার প্রতিবেশীকে ভালবাসতে আদেশ করে, ("Thou shalt love thy neighbour as thyself") সেই আইনটি কেবল কোনো নির্দিষ্ট পরিস্থিতির জন্য প্রযোজ্য নয়, বা এখানে ব্যক্তি মানুষটির পছন্দ-অপছন্দের বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ নয়। এই আইনটি হচ্ছে একজন সত্যিকারের মানুষ কিংবা, জাজের ভাষায়, একজন বিশ্বজনীন মানুষ হওয়ার আদেশ। আমাদের প্রতিবেশীকে ভালবাসা হচ্ছে আমাদের কর্তব্য। আমরা চাই বা না চাই, আমাদের ভালো লাগুক বা একঘেয়ে লাগুক আমাদের এই কর্তব্য আমাদেরকে করতেই হবে। সক্রেটিস জানতেন যে তাঁকে অন্যায়ভাবে মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেওয়া হয়েছে কিন্তু তারপরও, আইন এড়িয়ে পালিয়ে যাওয়ার যথেষ্ট সুযোগ পাওয়া সত্ত্বেও, তিনি পালান নি। তিনি মনে করতেন, আইন এড়িয়ে পালিয়ে যাওয়া এক ধরনের নৈতিক অপরাধ, কারণ একজন নাগরিক হিসেবে তিনি 'নগরের' আইনশৃঙ্খলা মানতে বাধ্য এবং সমাজের আইন অমান্য করার অর্থ হচ্ছে যৌথ জীবনযাপন পদ্ধতির ভিত্তিভূমিতে আঘাত করা। সফোক্লিসের নায়ক ইডিপাস যখন সত্যের কাছাকাছি পৌঁছে যাচ্ছিলেন, তখন তিনি ইচ্ছে করলেই সবকিছু ধামাচাপা দিয়ে করিন্থে গিয়ে রাজত্ব করতে পারতেন, কিন্তু তা না করে অজ্ঞানতাবশত ও অনিচ্ছাকৃত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হিসেবে নিজ হাতে নিজের দু চোখ উৎপাটন করে ক্ষমতা-বৈভবকে পেছনে ফেলে সম্পূর্ণ অসহায় নিঃসম্বল অবস্থায় থিবিস থেকে বেরিয়ে যান। আন্তিগোনেও প্রচলিত আইনের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে নিজের জীবন উৎসর্গ করার জন্য প্রস্তুত হন।

জাজের ভাষায় নৈতিক মানুষ "নিজেকে কর্তব্যের পোশাক দিয়ে ঢেকে রেখেছে; তার কাছে এটা তার অন্তর্গত প্রকৃতির বহিঃপ্রকাশ।" কর্তব্য তার বাইরে নয় বরং ভেতরে অবস্থান করে। তাই, সক্রেটিসের মতো, "যে নৈতিকভাবে বাঁচে সে তার জীবনে বিশ্বজনীনতাকে প্রকাশ করে, সে নিজেকে বিশ্বজনীন মানুষে পরিণত করে।"

এই নৈতিক দাবিটিই জাজের নৈতিক অবস্থানের ভিত্তি। অনপেক্ষ পছন্দসমূহ দিয়ে আমরা নৈতিক মানদণ্ডগুলো প্রতিষ্ঠা করি এবং এই নৈতিক মানদণ্ডগুলোই সমগ্র মানবজাতিকে এক সূত্রে গাঁথে।

> যখন আমি নিজেকে অনপেক্ষভাবে পছন্দ করি, তখন আমি নিজেকে অনপেক্ষভাবে অসীম করি, কারণ আমি নিজেই অনপেক্ষ, কারণ আমি কেবল নিজের জন্য অনপেক্ষভাবে পছন্দ করতে পারি, এবং নিজেকে এরকম অনপেক্ষভাবে পছন্দ করে নেওয়াটাই হচ্ছে আমার স্বাধীনতা, এবং যেহেতু আমি নিজেকে অনপেক্ষভাবে পছন্দ করি, কেবল এ কারণেই, আমি শুভ ও অশুভের ভেতরের পার্থক্যকে পরিষ্কার উপলব্ধি করতে পারি।[১০]

উপরের লাইনগুলো পড়তে পড়তে ঈভের কানে কানে বলা সাপের কথাগুলো মনে পড়ে যায়: "ঈশ্বর জানে যে যখন তুমি এটা খাবে, তোমার চোখ খুলে যাবে, এবং শুভ ও অশুভকে জানার ফলে তুমি ঈশ্বরের মতো হবে।"[১১] জাজের মতে নৈতিক মানুষের মহিমা হল : সে অনপেক্ষ, এবং অনপেক্ষ হিসেবে সে শুভ ও অশুভের ভেতরকার পার্থক্যকে সুস্পষ্ট উপলব্ধি করতে পারে। বাইবেলের ভাষায় সে প্রায় ঈশ্বরের মতো হয়ে যায়। সে তার নিজের জন্য এবং সমগ্র মানবজাতির জন্য নৈতিক আইনকে পছন্দ করে এবং এটা অনপেক্ষ।

'A' কিংবা জাজ উইলিয়াম কেউই কিয়ের্কেগার্ডের কথা বলে না। কিয়ের্কেগার্ডের মতে (aesthete-এর মতো) বিবেকের দংশনকে উপেক্ষা করে কিংবা (নৈতিক ব্যক্তির মতো) নিজেই নিজের ন্যায়নিষ্ঠতার নির্ধারক হয়ে কেউ ঈশ্বরের মতো হতে পারে না। "ঈশ্বরের মতো হওয়ার" পরিষ্কার অর্থ হলো একজন পাপীতে পরিণত হওয়া; কোনো ব্যক্তি একজন বিশ্বজনীন মানুষ হতে পারে না। আবার চূড়ান্ত বিশ্লেষণে যে-সব আকাঙ্ক্ষা কেবল আকস্মিক ও ক্ষণস্থায়ী সেসব আকাঙ্ক্ষায় তাড়িত হয়ে, এবং মূল্যবোধ বিবর্জিত অবস্থায় কোনো ব্যক্তির পক্ষে বাঁচা সম্ভব নয়। নৈতিক স্তর হচ্ছে অলীক অনুমান, aesthetical স্তর হচ্ছে অর্থহীনতা। দুটোই হতাশা।

'A'-এর কাছে লেখা জাজ উইলিয়ামের দুটো লম্বা চিঠি *Either/Or*-এর দ্বিতীয় ভল্যুমের তিন শ পৃষ্ঠা জুড়ে ছড়িয়ে আছে। চিঠি দুটোর সার কথা খুব সংক্ষেপে এভাবে বলা যায় : হতাশাকে বেছে নাও! এমন একটা অবস্থানকে বেছে নাও যেখান থেকে হতাশাকে খুব ভালোভাবে দেখা যায় অর্থাৎ অনৈতিক জীবন যাপনকে খুব ভালোভাবে লক্ষ কর। হতাশাকে বেছে নেওয়ার অর্থ হচ্ছে নৈতিক অবস্থানকে বেছে নেওয়া; এটা হচ্ছে সেই বিশ্বজনীন নৈতিক আইনকে স্বতঃসিদ্ধ বলে ধরে নেওয়া যা আমাদের মৌলিক প্রকৃতিকে বর্ণনা করে। নৈতিকভাবে বাঁচার অর্থ হচ্ছে বিশ্বজনীন মানুষ হিসেবে বাঁচা, অনপেক্ষ হিসেবে বাঁচা, অনপেক্ষ হওয়া।[১২] বলাই বাহুল্য, জাজ উইলিয়াম 'A'- কে বোঝাতে সক্ষম হন নি, কারণ একজন aesthete-এর কাছে নৈতিকতা কোনো গুরুত্ব বহন করে না। যেখানে আমোদ ও আকাঙ্ক্ষা একজনের মানুষের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে, সেখানে বাধ্যবাধকতা ও কর্তব্য অর্থহীন হয়ে পড়ে।

এখানে আবার Either/or প্রসঙ্গটি চলে আসে। একজন হয় নীতিহীনতায় বাঁচবে, কেবল ভালো লাগা ও আকাঙ্ক্ষা পূরণের ওপর ভিত্তি করে তার যাবতীয় কার্যাবলি পরিচালিত হবে, বিশেষত তার উদ্দেশ্য হবে একঘেয়েমি কাটানো এবং চরমানন্দ উপভোগ করা; নাহয় একজন নৈতিকতা নিয়ে বাঁচবে এবং এভাবে নিজেকে অনপেক্ষভাবে পছন্দ করতে করতে অনপেক্ষ হয়ে উঠবে। *Either/Or* বইতে দুটো বিকল্প আছে : আকাঙ্ক্ষা বা কর্তব্য।*

---

* সোকি *Either/Or*-এর দ্বিতীয় ভল্যুমে লিখেছেন : একজন aesthete একটি সম্ভাবনা থেকে [একটা সম্ভাবনাকে জিইয়ে রেখে] চিরকাল আনন্দ পেতে চায়; একজন নৈতিক মানুষ কোনো কালক্ষেপ না করে এসপার-ওসপার সিদ্ধান্ত নিয়ে নেয়। তাই জাজ বলতে পারে : আমি সম্ভাবনা, স্বাধীনতা ও ভবিষ্যতের জন্য লড়ছি।

এ সম্পর্কে Louis Mackey তাঁর "The Poetry of Inwardness" প্রবন্ধে লিখেছেন : একজন aesthete তাঁর সম্ভাবনাকে অক্ষত অবস্থায় সংরক্ষণ করতে চায় বলেই শেষ পর্যন্ত কোনো সম্ভাবনাকে ধরে রাখতে পারে না, কারণ সে কখনোই সেগুলোকে বাস্তবায়িত করে না এবং একটি অবাস্তবায়িত সম্ভাবনা একজন কৃপণের সোনার চেয়ে বেশি লাভজনক নয়।

এদেরকে একে অপরের বিকল্প মনে হলেও তারা আসলে দুটি চরম বিপরীত বিষয়কে প্রকাশ করে। একদিকে 'A' এমন একটি জীবনের প্রেমে পড়ে যেখানে কোনো বাধ্যবাধকতা বা মূল্যবোধ নেই, যেখানে একজন ব্যক্তিমানুষ কী করল বা না-করল তাতে কিছুই যায় আসে না। 'A' কীভাবে জীবনকে দেখে তার দুটো উদাহরণ লক্ষ করা যাক :

> জীবনের প্রতি আমার দৃষ্টিভঙ্গি চরম অর্থহীন, যেন কোনো অশুভ আত্মা এসে আমার নাকের ওপর একটি চশমা সেঁটে দিয়েছে, এর একটি কাচের বিবর্ধনকারী ক্ষমতা খুব বেশি, কিন্তু অন্য কাচ দিয়ে দেখলে সবকিছু খুবই ছোট দেখায়।

> যত হাস্যকর বিষয় আছে তাদের মধ্যে সবচেয়ে হাস্যকর হচ্ছে একজন ব্যস্ত মানুষ যে খুব দ্রুত কাজ করে এবং চটপট খায়। তাই আমি যখন কোনো ব্যস্ত মানুষের সংকটাপন্ন মুহূর্তে একটি মাছিকে এসে তার নাকের ওপর বসতে দেখি, অথবা তার চেয়েও ব্যস্ত কোনো গাড়িকে দ্রুত তার পাশ দিয়ে চলে যাওয়ার সময় তার ওপর কাদা ছিটাতে দেখি, অথবা সে সামনে আসা মাত্র কোনো ড্রব্রিজকে (drawbridge) খুলে যেতে দেখি, বা ছাদ থেকে খসে পড়া কোনো টাইলের আঘাতে তাকে মৃত্যুবরণ করতে দেখি, আমি তখন প্রাণ খুলে হাসি। এবং কে-ই বা না-হেসে পারবে? কী পায় এসব করিতকর্মা মানুষরা? তারা কি সেইসব গৃহবধূদের মতো নয় যারা ঘরে আগুন লেগে গেলে উত্তেজনার বশে সবার আগে গিয়ে fire-tong রক্ষা করে? জীবনের সর্বগ্রাসী আগুন থেকে এর চেয়ে বেশি কী আর রক্ষা করতে পারে তারা?[১৩]

অন্য দিকে জাজ উইলিয়াম তৃপ্ত হয়ে ভাবেন যে একজন নিজে যা, তা হতে পারলেই বিশ্বজনীন হতে পারে, অনপেক্ষ হতে পারে, ঈশ্বরের মতো হতে পারে এবং জানে কোনটি শুভ এবং কোনটি অশুভ। নৈতিকতা মানুষকে শুদ্ধ ও সুন্দর করে। কর্তব্যবোধ আমাদের মধ্যেই অবস্থান করে, একে বাহির থেকে চাপিয়ে দিতে হয় না। একজন মানুষ নিজের কর্তব্য পালন করে অনপেক্ষ হতে পারে—সে নিজে যা, তা-ই হতে পারে।

Either/Or-এ এভাবেই চরম বিকল্প বিষয় দুটো উল্লেখ করা হয়েছে। সাধারণ বুদ্ধিতে আমরা বুঝতে পারি, মানবজীবন এই দুটি চরম বিকল্পের কোনোটিতেই অবস্থান করে না। মানুষের চরিত্রে এই দুটি স্তরের (stage) বৈশিষ্ট্যসমূহ মিলেমিশে থাকে। কারো মধ্যে হয়তো aesthetical উপাদান বেশি থাকে, কেউ-বা বেশি নৈতিক হয়। আমরা সবাই আনন্দ পেতে চাই এবং একঘেয়েমি এড়ানোর চেষ্টা করি। আমরা আমাদের কামনাকে তৃপ্ত করতে চাই এবং ভালোভাবে সময় কাটানোর চেষ্টা করি। কিন্তু আমরা কর্তব্যকে অস্বীকার করি না। আমরা যা করতে চাই তা অনেক সময় করতে পারি না। অনেক কিছুই আমরা করতে হবে বলে করি। এই বাধ্যবাধকতাগুলো আছে বলেই সমাজগঠনের প্রাথমিক শর্তগুলো পূরণ হয়। কেউ আদেশ করে বলে যে আমি সত্য বলতে বাধ্য হই তা নয়, আমি সত্য বলি কেননা সত্য না বললে আমাদের সাধারণ দৈনন্দিন জীবন অচল হয়ে যাবে। আমরা একে অপরের ওপর যদি আস্থা না রাখতে পারি এবং একে অপরের কথা বিশ্বাস করতে না পারি তা হলে সমাজ টিকবে না। আমরা সবাই aesthetical এবং নৈতিক বিষয়গুলোর সঙ্গে পরিচিত, কারণ এরা কমবেশি আমাদের সবার অস্তিত্বেই মিশে থাকে। তাদেরকে আলাদাভাবে চেনা যায়, কিন্তু তাদেরকে পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। তারা মানবীয় অস্তিত্বের অবিচ্ছেদ্য অংশ।

কিয়ের্কেগার্ডের অনেক পাঠক-সমালোচক মনে করেন যে কিয়ের্কেগার্ড মানবজীবনের

তিনটি স্তরকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখেছিলেন; অর্থাৎ কিয়ের্কেগার্ড ভেবেছিলেন যে মানুষ প্রথমে aesthetical, পরে নৈতিক এবং সর্বশেষে গিয়ে ধর্মীয় স্তরে উপনীত হয়। এরকম ভাবার একটি কারণ হয়তো এই যে সত্যি সত্যিই যৌবনে একজন মানুষের মধ্যে ভোগবাদী প্রবণতা একটু বেশি থাকে, বিশেষ করে বিয়ের আগে সে সুখ ও ভোগের পেছনে যত্রতত্র ছোটে (এই ভোগসুখ যে কেবল ইন্দ্রিয়জাত তা নয়, এটা আবেগজাত কিংবা বুদ্ধিজাতও হতে পারে)। এক সময় ভোগসুখের প্রতি বিতৃষ্ণ হয়ে ওঠে সে এবং বিয়ে করে। বিয়ের পর পারিবারিক ও সামাজিক দায়দায়িত্বের প্রতি সচেতন হয়, জীবন অনেক সুশৃঙ্খল হয়ে ওঠে। তারপর একদিন এই পারিবারিক ও সামাজিক জীবনও একঘেয়ে লাগে এবং বৃদ্ধ বয়সে, অবসর জীবনে, পারিবারিক বা সামাজিক কর্তব্য পালনের চেয়ে ধর্মের প্রতি বেশি মনোযোগী হয়ে ওঠে। মানুষের এরকম পরিবর্তন আমরা অহরহই দেখি। যে ছেলেটা পাড়ার রকে রকে দিনরাত মাস্তানি করে বেড়ায়, দেখা যাবে সে-ই কিছুদিন পর চাকরিবাকরি নিয়ে, বিয়ে-থা করে ভদ্র হয়ে যাচ্ছে; সে-ই, আরেকটু বয়স হলে, দাড়ি রেখে টুপি পরে পাঁচ বেলা মসজিদে যাতায়াত করছে। কিয়ের্কেগার্ডের *Either/Or*- এর একজন সাধারণ যুবকের গল্পও মোটামুটি এরকম : যুবকটি সর্বদা ভোগসুখের পেছনে ছোটে, কিন্তু যদিও ইন্দ্রিয়জ বা নান্দনিক আনন্দলাভের কোনো সুযোগই সে নষ্ট করে না তবুও সে ক্রমাগত হতাশায় নিমজ্জিত হয়। একসময় সে ভোগসুখবাদী জীবন পরিত্যাগ করে সংযমী ও সৃষ্টিশীল হতে চায়, ভোগের জীবন থেকে সরে এসে কর্তব্য ও দায়িত্বপূর্ণ জীবন বেছে নেয়। সে তার ক্যারিয়ার গড়ে তোলে, বন্ধুবান্ধব জুটে যায়, বিয়ে করে স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সমাজে একটা সম্মানজনক অবস্থান লাভ করে। কিন্তু তখন পুরোনো, বিস্মৃত সেই হতাশা আবার তাকে গ্রাস করে যা "আগের যে কোনো সময়ের চেয়ে বেশি ভয়ঙ্কর"।

খুব মোটা দাগে আঁকলে মানুষের জীবন-ছবি হয়তো মোটামুটি এরকমই। কিন্তু আরেকটু ভালো করে লক্ষ করলে আমরা দেখব যে পাড়ার মাস্তানটিও সমাজ ও পরিবারের প্রতি কিছু দায়দায়িত্ব পালন করে, প্রত্যেক দিন পাঁচ বেলা মসজিদে না গেলেও সপ্তাহে একবার অন্তত যায়; ওই সংসারী যুবকটিও ভোগসুখ বাদ দিয়ে একেবারে সাত্ত্বিক হয়ে যায় না, সে আনন্দ-স্ফূর্তিও করে, কিছু ধর্ম-কর্মও বজায় রাখে; এবং বৃদ্ধ হওয়ার পর একজন মানুষ যে শুধু ধর্ম-কর্ম করে তা নয়, ধর্ম-কর্মের ফাঁকে ফাঁকে সে যেমন আমোদ-আহ্লাদে মগ্ন হয় তেমনি সামাজিক ও পারিবারিক দায়িত্বও পালন করে। অর্থাৎ একজন মানুষ শুধু ভোগবাদী (aesthete) কিংবা শুধু নৈতিক বা কেবল ধার্মিক হতে পারে না। এরকম বিমূর্ত মানুষের কল্পনা করা যায় কিন্তু বাস্তবে এরকম মানুষের অস্তিত্ব অসম্ভব। কিয়ের্কেগার্ডের aesthete 'A' কিংবা নৈতিক চরিত্র জাজ উইলিয়াম তাই বাস্তবসম্মত চরিত্র নয়। তারা মানবীয় চরিত্রের দুটো দিকের personification মাত্র।*

আমরা যদি ধরে নিই যে এই দুটো স্তরকে পৃথক করা যায় এবং বাস্তবে তারা পৃথকভাবে অস্তিত্বশীল হয় তা হলে বেশ মজার দু-একটি বিষয় পরিলক্ষিত হবে। একজন মানুষ তার aesthetical অবস্থান থেকে সম্ভবত কখনোই নৈতিকতাকে অনুধাবন করতে পারবে না, সে কখনোই বুঝতে পারবে না 'কর্তব্য' শব্দটির সত্যিকারের অর্থ কী। এক্ষেত্রে একজন aesthete বলবে যে এই দিগ্‌ভ্রান্ত মানুষগুলো যাকে কর্তব্য বলে আসলে সেগুলো

---

* Louis Mackey তাঁর "The Poetry of Inwardness" -এ বলেছেন "Johannes is a possibility, not a person. Just as pure sensuality (Don Juan) is possible only in art, so also is pure reflection (Johannes the Seducer).

করার জন্য তারা মনের ভেতর অসচেতনভাবে আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে। তবে তাদের মস্তিষ্ক এই আকাঙ্ক্ষার কথা তাদের কাছে গোপন করে কারণ তারা সম্ভবত ভয় পায়। তারা ভয় পায় যে ওইসব কাজ করে আনন্দ পেলে কিংবা প্রশংসিত হলে বা পুরস্কৃত হলে তাদের শাস্তি হবে। অর্থাৎ একজন aesthete সবসময়ই তার নিজের ক্যাটাগরি (category)* দিয়ে নৈতিকতাকে ব্যাখ্যা করতে পারে বটে কিন্তু নৈতিকতার যেটা মূল বিষয় সেটা—অর্থাৎ স্থান-কাল-পাত্র যাই হোক না কেন, একজন মানুষকে যে কোনো অবস্থায় তার কর্তব্য পালন করতে হবে—একজন aesthete-এর পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়। একজন aesthete নৈতিক শব্দ ব্যবহার করে বটে কিন্তু তা নৈতিক অর্থ বহন করে না। যেমন *Either/Or*-এর প্রথমে ভল্যুমে প্রতারক ইওহানেস (Johannes the Seducer) ভুলিয়ে-ভালিয়ে একটি নিষ্পাপ মেয়েকে বশ করে তারপর বিষয়টিকে খুব নৈতিকভাবে ব্যাখ্যা করে:

> আমি কি কর্ডেলিয়াকে ভালবাসি? হ্যাঁ। আন্তরিকভাবে? হ্যাঁ। বিশ্বস্ততার সঙ্গে? হ্যাঁ—aesthetical অর্থে, কিন্তু এরও একটা অর্থ আছে। এই মেয়েটি যদি কোনো নির্বোধ বিশ্বস্ত স্বামীর হাতে পড়ত তো কী লাভ হত? সেক্ষেত্রে এই মেয়েটির কী হত? কিছু না। বলা হয় যে জগতে চলতে গেলে সততার চেয়েও বেশি কিছু লাগে। আমি বলব যে শুধু সততা দিয়ে এরকম একটি মেয়েকে ভালবাসা যায় না, তার চেয়েও বেশি কিছু লাগে। এই বেশিটুকুই আমার আছে—এটা হচ্ছে শঠতা। এবং সবকিছুর পরও, আমি একজন বিশ্বস্ত প্রেমিকের মতোই ভালবাসি তাকে।[১৪]

এই প্রসঙ্গে ইওহানেস আরেক জায়গায় বলে :

> হ্যাঁ, কিন্তু তার নিজের ভালোর জন্য; আমি যখন দেখেছিলাম তাকে, সে কেবলই এক বালিকা ছিল, যখন ছেড়ে এলাম তখন সে প্রাপ্তবয়স্কা মহিলা। প্রলোভিত করে আমি তাঁকে ধ্বংস করি নি, বরং সৃষ্টি করেছি; এই প্রথমবারের মতো সে স্বাধীন, আত্মসচেতন এবং পূর্ণ বিকশিত হয়েছে। তার স্বামী—যদি সে কাউকে খুঁজে পায়—এই অবদানের জন্য ইওহানেসের কাছে ঋণী হয়ে থাকবে।

'A' নৈতিকভাবে গুরুত্বহীন কিছু নৈতিক শব্দ ব্যবহার করে। কর্ডেলিয়ার সঙ্গে তার সম্পর্ক স্থাপনের উদ্দেশ্য হল অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে মেয়েটিকে প্রলোভিত করে তার মন ও যৌনতাকে উন্মোচন করা। তার কাছে এই কাজটি বেশ মজার এবং এই কারণেই সে মেয়েটির প্রতি বিশ্বস্ত হয়। সে যে নৈতিক শব্দগুলো ব্যবহার করে, তাদের নৈতিক গুরুত্ব সম্পর্কে সে মোটেই সচেতন নয়। জাজ উইলিয়ামের মতো একজন নৈতিক মানুষের দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টিকে দেখলে বলতে হয় যে ওগুলোকে (নৈতিক শব্দগুলো) বোঝার মতো মানসিক প্রস্তুতি নেই তার, অর্থাৎ "নিজের শাশ্বত বৈধতায় নিজেকে পছন্দ করার" ইচ্ছে নেই তার। উপরন্তু বিশ্বজনীন নৈতিক আইনকে মেনে নিজের কাজের দায়দায়িত্ব বহন করার কোনো ইচ্ছে নেই 'A'-র। একজন aesthete-এর কাছে 'কর্তব্য' হচ্ছে একটি শূন্যগর্ভ ধারণা। তাই সবকিছুই সম্ভব, সবকিছুই অনুমোদনযোগ্য, এবং চূড়ান্তভাবে কোনোকিছুই একঘেয়েমির পাশ কাটিয়ে যেতে পারে না। চূড়ান্ত বিশ্লেষণে সব পরিস্থিতিতেই সে নির্লিপ্ত থাকে। একঘেয়েমিকে এড়িয়ে যাওয়া কিংবা আনন্দ উপভোগ করা ছাড়া আর কিছু সে করতে চায় না। আমার জীবন নিয়ে আমি কী করব? যদি পার—উপভোগ কর।

---

* ক্যাটাগরি হচ্ছে অভিজ্ঞতাকে ব্যাখ্যা করার একটি মৌলিক ধারণা (concept)।

একজন aesthete যেমন একজন নৈতিক মানুষকে বোঝে আবার বোঝে না, একজন নৈতিক মানুষের ক্ষেত্রেও একই সমস্যা। সেও একজন aesthete-কে এক অর্থে বোঝে আবার অন্য অর্থে বোঝে না। জাজ উইলিয়াম মনে করতে পারে যে 'A' তার শাশ্বত বৈধতায় নিজেকে পছন্দ করতে অস্বীকার করেছে, এবং তাই সে নৈতিকভাবে কাজ করতে পারে না। কিন্তু জাজ উইলিয়াম এটা বিশ্বাস করতে পারে না যে 'A'-র পক্ষে পুরোপুরি অনৈতিক হওয়া সম্ভব। ৫৪ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত—"যদি বিয়ে করেন আপনি পস্তাবেন, যদি বিয়ে না করেন, তাও আপনি পস্তাবেন...," কথাগুলো উল্লেখ করে জাজ লেখেন :

> সত্যিকার অর্থে এটাই যদি তোমার মনের কথা হয়, তা হলে আর কিছু করার নেই; তুমি যেমন, সেভাবেই তোমাকে গ্রহণ করতে হবে এবং এই ভেবে অনুশোচনা হবে যে বিষণ্ণতা [শাব্দিক অর্থে heavy-mindedness] বা চপল মানসিকতা তোমার আত্মাকে দুর্বল করে ফেলেছে।[১৫]

কিন্তু জাজ উইলিয়াম এ কথা স্বীকার করতে রাজি নন যে 'A' যে-ধরনের জীবনের কথা বলে, সে-ধরনের জীবন যাপন করা সম্ভব, কারণ তিনি কোনোভাবেই একজন পুরোপুরি অনৈতিক মানুষের কল্পনা করতে পারেন না। তিনি 'A' কে লেখেন : একজন সজীব, স্বাস্থ্যবান, খাঁটি, বুদ্ধিমান ও আশাবাদী যুবকের কথা কল্পনা কর এবং মনে কর সে তোমার প্রতি পুরো আস্থা নিয়ে সুচিন্তিত পরামর্শের জন্য তোমার কাছে এসেছে, তুমি কি "সবকিছু অর্থহীন"—এই কথা বলে তাকে নিরাশ করে দেবে? না, তুমি তা করবে না। তার মহৎ গুণগুলোই তোমাকে চিন্তাশীল করে তুলবে। তোমার ভালো স্বভাব, তোমার সহানুভূতি তখন সক্রিয় হয়ে উঠবে; সেই মনোভাব নিয়ে তুমি তার সঙ্গে কথা বলবে। তুমি তার আত্মাকে সুরক্ষিত করবে, জগতের ওপর তার যে বিশ্বাস ছিল তুমি তাকে দৃঢ় করবে, তুমি তাকে এই বিষয়ে নিশ্চিত করবে যে মানুষের মধ্যে এমন ক্ষমতা আছে যার জোরে সে পুরো পৃথিবীকে অগ্রাহ্য করতে পারে, এবং তুমি তাকে এমনভাবে বোঝাবে যেন সে তার সময়কে ভালোভাবে ব্যবহার করার বিষয়টি গুরুত্বের সঙ্গে নেয়। এই সবই তুমি করতে পার, এবং তুমি যখন তা করবে, খুব ভালোভাবে করতে পারবে।[১৬] অল্প কথায় জাজের মতে A-র পক্ষে ওই যুবকটির সঙ্গে নৈতিক ব্যবহার না করে উপায় নেই।

কিন্তু 'A' তো তা করবে না। সে হয়তো জাজ যা বলল তার সবই কিংবা অংশবিশেষ করবে, কিন্তু সে তা করবে তার aesthetical দৃষ্টিভঙ্গি থেকে। এটা করতে গিয়ে সে ওই যুবকটিকে ওই ধরনের ভালবাসার কথাই বলবে যে ধরনের ভালবাসা আমরা প্রতারক ইওহানেসের মধ্যে প্রত্যক্ষ করেছি; নৈতিকতা নিয়ে সে মাথা ঘামাবে না। কিন্তু জাজ তার দৃষ্টিভঙ্গি সম্পর্কে এত নিশ্চিত যে তিনি লেখেন, "আমি খুব ভালো করেই জানি যে-জগৎকে যে-বিবাদাত্মক চেহারা তুমি দেখাও তা তোমার আসল রূপ নয়।"[১৭]

'A' কিংবা জাজ উইলিয়াম কেউই কাউকে বুঝতে পারে না কারণ কিয়ের্কেগার্ড এমন চরম দুটো বিষয়কে সৃষ্টি করেছেন যাদের বাস্তব অস্তিত্ব নেই। কারণ উপর্যুক্ত দুটো বিষয়ের কোনো একটির আলাদাভাবে বাস্তবে অস্তিত্বশীল হওয়া সম্ভব নয়। বাস্তব অস্তিত্বে নৈতিক ও aesthetical—দুটো বিষয়ই যুগপৎভাবে অবস্থান করে। আমাদের দৈনন্দিন জীবনে আমরা দুটি বিষয়কেই স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করি, আমি কী চাই এবং আমার কী করা উচিত—এই দুইয়ের টানাপড়েনেই আমাদের জীবন গড়িয়ে চলে। কিয়ের্কেগার্ডের উদ্দেশ্য ছিল কোপেনহেগেনবাসী ফিলিস্তিনদের আঘাত করা, তারা যেন তাদের আত্মিক অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হয়, যে aesthetic ও নৈতিক বিষয় নিয়ে তারা মেতে আছে, সেই aestheticism

ও নৈতিকতার সত্যিকার অর্থ যেন তারা উপলব্ধি করে। *Either/Or*-এ এই দু ধরনের দৃষ্টিভঙ্গিকেই অবাস্তব বলে উল্লেখ করা হয়েছে। আমাদের মানবীয় অস্তিত্বে যে বিকল্পগুলো আছে তা aesthetical কিংবা নৈতিক নয়। বরঞ্চ সোকি *The Sickness Unto Death* গ্রন্থে লিখেছেন, এই বিকল্পগুলো হচ্ছে পাপ ও বিশ্বাস। উপরন্তু এই দু জোড়া বিকল্পও আবার পরস্পরের সমান্তরাল নয়। চূড়ান্ত অর্থে নৈতিকতার ভিত্তি aesthetical-এর ভিত্তির চেয়ে শক্ত নয়; দুটোই চেতনাজাত, দুটোই কাল্পনিক এবং অস্তিত্বের সঙ্গে সম্পর্কবর্জিত।

এভাবে কিয়ের্কেগার্ডের সমসাময়িক যেসব ফিলিস্তিনরা নিজেদেরকে নৈতিক মনে করে তৃপ্ত ও গর্বিত ছিল তারা বুঝল যে মুনাফা ও ভোগসুখের পেছনে ছুটন্ত aestheteদের চেয়ে তাদের অবস্থা মোটেও উন্নত নয়। কিয়ের্কেগার্ড মনে করতেন তাঁর শহর কোপেনহেগেনে দু-ধরনের মানুষই ছিল। কিন্তু দুঃখজনকভাবে তারা তাদের সত্যিকার অবস্থা সম্পর্কে সচেতন ছিল না। তারা যদিও নিজেদেরকে খ্রিষ্টান ভাবত কিন্তু তারা জানত না খ্রিষ্টান হওয়ার অর্থ কী বা কীভাবে খ্রিষ্টান হিসেবে বাঁচতে হয়। এরকম একটি বিভ্রান্তিকর অস্তিত্ব সম্পর্কে কিয়ের্কেগার্ডের শ্লেষাত্মক বর্ণনা লক্ষ করা যাক :

> এটা খুবই হাস্যকর যে একজন ব্যক্তি, অশ্রুসজল অবস্থায়,..., বসে এবং "আত্ম-প্রত্যাখ্যান" কিংবা "সত্যের খাতিরে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করার মহত্ত্ব সম্পর্কিত ব্যাখ্যা পড়ে বা শোনে এবং তারপর ঠিক পরমুহূর্তেই, ein, zwei, drei, vupti, প্রায় চোখভর্তি পানি নিয়ে পূর্ণোদ্যমে, গলদ্ঘর্ম অবস্থায় তার সর্বোচ্চ শক্তি দিয়ে সে অসত্যকে জয়ী হতে সাহায্য করে। এটা খুবই হাস্যকর যে একজন বক্তা, আন্তরিক কণ্ঠস্বর ও অঙ্গভঙ্গি দিয়ে, নিজে গভীরভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে এবং অপরকে গভীরভাবে উদ্বুদ্ধ করে, খুব চমৎকারভাবে সত্যকে প্রকাশ করতে পারেন; সাহসিকতার সঙ্গে, ঠাণ্ডা মাথায় আত্মপ্রত্যয় নিয়ে নির্ভীকভাবে, প্রশংসাযোগ্য পদক্ষেপ নিয়ে সব নারকীয় ও অশুভ শক্তির মুখোমুখি হতে পারেন —এটা খুবই হাস্যকর যে সেই ঠিক একই মুহূর্তে...সামান্য অসুবিধা দেখলেই তিনি ভীরু ও কাপুরুষের মতো পালিয়ে যান...যখন আমি কাউকে ঘোষণা করতে দেখি যে যিশু কীভাবে একজন সাধারণ, দরিদ্র দাস কিংবা বঞ্চিত ও উপহাসের পাত্র হিসেবে জীবন যাপন করতেন...তা সে পরিপূর্ণভাবে বুঝতে পেরেছে—আমি যখন সেই একই ব্যক্তিকে কোনো ভালো অবস্থানে, জাগতিক বিচক্ষণ ব্যক্তিরা যাকে ভালো অবস্থান বলে চিহ্নিত করেন, পৌঁছানোর জন্য সতর্কভাবে পথ করে নিতে দেখি, তার নিজের নিরাপত্তা যতটা সম্ভব নিশ্চিত করতে দেখি, যখন আমি তাকে খুব উদ্বিগ্নভাবে ডান বা বাম দিক থেকে আসা প্রতিকূল হাওয়াকে এমনভাবে এড়িয়ে যেতে দেখি যেন একটু এদিক-ওদিক হলেই জীবন বিপন্ন হবে তার, যখন আমি তাকে সুখী, কখনো কখনো চরম সুখী দেখি, যখন তাকে নিশ্চিন্ত দেখি, এতটাই নিশ্চিন্ত যে সে এমনকি সবার সম্মান ও শ্রদ্ধা লাভ করার জন্য ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দেয়—তখন আমি চুপিচুপি নিজেকে বলি : সক্রেটিস, সক্রেটিস, সক্রেটিস এটা কি সম্ভব যে এই মানুষটি যা বুঝেছে বলে দাবি করে, তা সে সত্যিই বুঝেছে?[১৮]

না, এটা খুবই স্পষ্ট যে এই মানুষটি তা বোঝে নি। এই বিষয়টি সে বুঝতে পারে না কারণ একজন ফিলিস্তিন হিসেবে তার চিন্তাক্ষমতা নেই। তার নিজের সম্পর্কে কোনো জ্ঞান নেই। তার মূল্যবোধ ও তার আত্মবিভ্রমের সঙ্গে যে তার উপরভাসা (superficial) একটি

সম্পর্ক আছে সে সম্পর্কেও তার কোনো ধারণা নেই। ফলে ঈশ্বরের সঙ্গে তার সম্পর্ক এবং তার জীবনের ওপর যে ঈশ্বরের একটা দাবি আছে—এসব নিয়ে সে মাথা ঘামায় না। এইসব বিষয় সে উপলব্ধিই করতে পারে না। যদি তার কাজের চাপ না থাকে সে চার্চে যায় এবং ঈশ্বরের কথা শোনার বিষয়টিকে খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। আসলে সে কেবল অন্য লোকদের কথা শোনে। সে একজন আদর্শ ফিলিস্তিন; ধার্মিক, নৈতিক, ব্যস্ত, আড্ডাপ্রিয়—এবং শূন্যগর্ভ।

প্রশ্ন হতে পারে যে, একজন মানুষের পক্ষে নিজেকে এভাবে সরাসরি প্রতারণা করা কি সত্যিই সম্ভব? কিয়ের্কেগার্ড মনে করতেন যে, সম্ভব এবং বেশিরভাগ মানুষই তাই করে। সাধারণভাবে বিচার করলে আমরা সবাই ফিলিস্তিন, তবে খুব খুঁজলে আমাদের মধ্যে হয়তো দু-এক জন সত্যিকারের ধার্মিক মানুষ পাওয়া গেলেও পাওয়া যেতে পারে (কিয়ের্কেগার্ড এ বিষয়ে নিশ্চিত ছিলেন না)। সত্য আত্মজ্ঞানের জন্য যা দরকার একজন ফিলিস্তিনের সেই অস্তিত্ববাদী পূর্বধারণা (existential presupposition) থাকে না; তার ভেতর 'বিশ্বাস' থাকে না। সে সব ধরনের 'ভালো কাজ' নিয়ে ব্যস্ত থাকে, ধর্মীয় কাজে অংশ নেয় এবং নিজের ছেলেমেয়েদেরকে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করে তাদের খ্রিষ্টান হওয়ার বিষয়টি নিশ্চিত করে। কিন্তু এতকিছুর পরও সে সেই খ্রিষ্টান জগতের, "সেই কিম্ভূত বিভ্রম"-এর অসহায় শিকার।

> ফিলিস্তিন/বুর্জোয়ার মনে আত্মার নির্ধারক (determinant of spirit) বলে কিছু থাকে না এবং এমন এক সম্ভাব্য রাজ্যে তার সমাপ্তি হয় যেখানে সম্ভাবনার কোনো গুরুত্ব নেই[১৯]; ফলে এখানে ঈশ্বরকে লক্ষ করার কোনো সম্ভাবনা নেই। শুঁড়ি কিংবা প্রধানমন্ত্রী যাই হোক না কেন সে সবসময়ই কল্পনাশক্তিবিবর্জিত। সে একটি নির্দিষ্ট তুচ্ছ অভিজ্ঞতার জগতে বাস করে, সে জাগতিক নিয়ম-কানুন জানে, সে জানে কোনটির সম্ভাবনা আছে, সে জানে সচরাচর কী কী ঘটে। এইভাবে একজন ফিলিস্তিন নিজেকে এবং ঈশ্বরকে হারায়।[২০]

এই ফিলিস্তিন-অবস্থা থেকে বেরোনোর কি কোনো উপায় আছে? প্রথম দৃষ্টিতে মনে হয় কিয়ের্কেগার্ড দুটো উপায়ের কথা বলছেন। একজন মানুষ যদি তার ফিলিস্তিন-অবস্থা সম্পর্কে সচেতন হয়, সে সঙ্গে সঙ্গে একজন aesthete হয়ে যায় এবং তারপর বিবেকের দংশনের প্রতি পুরোপুরি নির্লিপ্ত থেকে সে তার কামনা-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য যত্রতত্র ছোটে এবং যেভাবে পারে একঘেয়েমিকে এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করে। এটি হচ্ছে একটি উপায়। অন্যটি একই রকম, সমান অনিশ্চিত : একজন মানুষ নিজের শাশ্বত বৈধতায় নিজেকে বেছে নিতে পারে, শুভ ও অশুভের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টি করতে পারে এবং তার নিজের নীতিনিষ্ঠতায় নিরাপদে বাস করতে পারে।

কিয়ের্কেগার্ড ভালো করেই জানতেন যে এই দুটো পথের কোনোটিই আলাদাভাবে গ্রহণ করা যাবে না। আমরা, মানুষরা, অবধারিতভাবে যেমন ভোগের পেছনে ছুটি, তেমনি আবার একই সঙ্গে কর্তব্যও যে পালন করি না তা নয়। ফিলিস্তিন-অবস্থা থেকে বেরিয়ে যাওয়ার এই দুটো পথের কোনোটিই বাস্তবে অস্তিত্বশীল হতে পারে না। এরা বিমূর্ত। এদের সম্পর্কে চিন্তা করা যায়, কিন্তু বাস্তবে ওভাবে জীবনযাপন করা যায় না।

একজন ফিলিস্তিন একটু চিন্তা করলেই হয়তো তার aestheticism-কে লক্ষ করতে পারে এবং উপলব্ধি করতে পারে যে তার জীবনের একমাত্র লক্ষ্য হচ্ছে আনন্দের পেছনে ছোটা এবং যে-কোনোভাবে একঘেয়েমিকে এড়িয়ে যাওয়া। এভাবে যা-যা সে আঁকড়ে

ধরে, তাই হয়ে ওঠে তার জীবনের আদর্শ। এইভাবে চিন্তার মাধ্যমে সে তার মূল্যবোধ ও কর্তব্যকে খুঁজে পায় এবং এই মূল্যবোধ ও কর্তব্যকে খুঁজে পাওয়ার পর সে এমন অনপেক্ষ বিচার করতে প্রবৃত্ত হয় যার নৈতিক বৈধতা সম্পর্কে তার কোনো সন্দেহ থাকে না। এই চিন্তা হয়তো তার অস্তিত্বের অবস্থানে কোনো পরিবর্তন আনতে পারে না, তবে তার জীবনের দ্বন্দ্বগুলোকে আরো তীব্র করে দেয়।

কিয়ের্কেগার্ডের মতে ফিলিস্তিন অবস্থা থেকে বেরোবার কিংবা সত্যিকার অর্থে মোক্ষলাভ করার একটিই মাত্র উপায় আছে। সেটা হচ্ছে খ্রিস্টান হওয়া। কিন্তু একমাত্র ঈশ্বরের করুণা বর্ষিত হলেই তা হওয়া সম্ভব। এখানে আমাদের কিছু করার নেই, এটা প্লেটোর সেই জ্ঞানের সিঁড়ি* বেয়ে উপরে উঠে যাওয়ার মতো কোনো ব্যাপার নয়। অর্থাৎ খ্রিস্টান হওয়া মানে অস্তিত্বের উচ্চতম স্তরে পৌঁছানোর মতো কোনো বিষয় নয়। একজন লেখক হিসেবে কিয়ের্কেগার্ড কেবল পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারেন। যেমন *Either/Or* পড়ে একজন ফিলিস্তিন পাঠক সম্ভবত তিনটি বিষয় আবিষ্কার করতে পারে। প্রথমত, সে একজন ফিলিস্তিন; দ্বিতীয়ত, জীবনের aesthetical উপাদানগুলো বাড়ালে কিংবা সেগুলো চর্চা করলে তা আরো গভীর নিরাশা ও হতাশার দিকে টেনে নিয়ে যাবে; তৃতীয়ত অনপেক্ষ হওয়ার বিভ্রমের ওপর ভিত্তি করে গঠিত আত্ম-ন্যায়নিষ্ঠতা নৈতিকভাবে শুদ্ধ না করে তাকে অতিমাত্রায় দাম্ভিক ও মামুলি করে দেবে। সোকি কি এভাবে সূক্ষ্ম খোঁচা দিয়ে একজন ফিলিস্তিনকে খ্রিস্টান করতে চেয়েছেন? না, তিনি তা চান নি, কারণ তিনি জানতেন যে চাইলেও তিনি তা পারবেন না। একটি বই একজন মানুষকে খ্রিস্টান করতে পারে না, একটি বই কেবল কিছু বিষয় সম্পর্কে একজন মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারে। ঈশ্বর অনুগ্রহ করলেই একজন মানুষের পক্ষে খ্রিস্টান হওয়া সম্ভব। এক্ষেত্রে কিয়ের্কেগার্ডের ভেতর আমরা যেন লুথারের সেই ঘোষণার অনুরণন শুনতে পাই : যিশুখ্রিস্টের প্রতি বিশ্বাসের মাধ্যমে স্বর্গীয় আশীর্বাদ পেলেই মোক্ষলাভ সম্ভব।

তথ্যসূত্র :

১. গোলাম ফারুক, ১৯৯৬, *প্লেটো দর্শন ও রাষ্ট্রচিন্তা*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী, পৃঃ ১৯

২. Ibid., পৃ. ২৩

৩. Hartshorne, M. Holmes, 1990, *Kierkegaard Godly Deceiver*, New York, Columbia University Press, p. XV

৪. Ibid., p. XV

৫. Kierkegaard, Søren, 1962, *The Point of View of My Work as an Author: A Report to History*, trans. Walter Lowrie, New York, Harper Torchbook, p.26

৬. Hartshorne, M. Holmes, 1990, *Kierkegaard Godly Deceiver*, New York, Columbia University Press, p.16

৭. Ibid., p. 16

৮. Ibid., p.17

৯. Ibid., p.18

---

* প্লেটো বলেছিলেন জ্ঞানের উচ্চতম স্তর হচ্ছে প্রজ্ঞার স্তর। এই স্তরে পৌঁছাতে হলে একজন মানুষকে অন্তত তিনটি ধাপ পেরোতে হয়। সিঁড়ির এই তিনটি ধাপ অতিক্রম করতে পারলেই প্রজ্ঞালাভ সম্ভব।

১০. Ibid., p.20

১১. Genesis 3: 5

১২. Kierkegaard, Søren, 1971, *Either/Or, Vol. II*, trans. Walter Lowrie. Princeton, Princeton University Press.

১৩. Hartshorne, M. Holmes, 1990, *Kierkegaard Godly Deceiver*, New York, Columbia University Press, p.2

১৪. Kierkegaard, Søren, 1971, *Either/Or*, Vol. I, trans. David F. and Lillian Marvin Swenson, Princeton, Princeton University Press p. 320

১৫. Ibid., Vol. *II*, p. 134

১৬. Ibid., p.137

১৭. Ibid., p.139

১৮. Kierkegaard, Søren, 1980, *The Sickness Unto Death*, ed. and trans. Howard V. Hong and Edna H. Hong, Princeton, Princeton University Press, p.91

১৯. Ibid., p.37, 38

২০. Ibid., p.41

শেষ কথা

১

পূর্ববর্তী অধ্যায়গুলো পড়ে আমাদের মতো অনেক সাধারণ পাঠকের মনে হতেই পারে যে কিয়ের্কেগার্ডের এইসব কথা আর নতুন কী! আমাদের চারপাশের মোল্লা-ঠাকুর-পাদ্রি-ভান্তেরা তো এরকম কথা প্রায় সবসময়ই বলেন। ধর্মীয় পথে চলার সময় যুক্তির কাঁটায় পা বিঁধে গেলে এরকম উপদেশ তো আমরা হরহামেশাই শুনি যে 'দু-পাতা ইংরেজি' থেকে অর্জিত যুক্তি-বুদ্ধিকে ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে অখণ্ড মনোযোগে বিশ্বাসকে আঁকড়ে ধরতে না পারলে মুক্তি নেই। কিন্তু ধর্মীয় নেতাদের এই বিশ্বাস হচ্ছে নিশ্চিত বিশ্বাস, অর্থাৎ ঈশ্বর-স্বর্গ-নরক ইত্যাদি বিশ্বাস করে, সঠিকভাবে প্রচলিত ধর্মীয় নিয়মকানুন মেনে চলতে পারলে যে আমি অবশ্যই স্বর্গে যেতে পারব এই বিশ্বাস; অর্থাৎ আমার আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধব যেভাবে যুক্তি ব্যবহার না করে কিংবা একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত প্রচলিত যুক্তির আশ্রয় নিয়ে নির্দ্বিধায় ঈশ্বর ও ধর্মকে বিশ্বাস করছে সেরকম বিশ্বাস।

কিয়ের্কেগার্ড এরকম বিশ্বাসের কথা বলেন নি। আপনি যদি শুধু একটি মুসলিম পরিবারে কিংবা একটি মুসলিম আবহাওয়ায় লালিত-পালিত হওয়ার কারণেই আল্লাহ্, কোরআন ও হাদিসের সত্যতা সম্পর্কে নিশ্চিত হন এবং তাতে বিশ্বাসী হয়ে ওঠেন, কিয়ের্কেগার্ড আপনার বিশ্বাসের কোনো মূল্য দেবেন না, কিংবা আপনাকে সত্যিকারের মুসলিম বলবেন না। তিনি আপনাকে 'ফিলিস্তিন' আখ্যা দেবেন; কারণ আপনি যে আল্লাহ, কোরআন ও হাদিসে বিশ্বাস করছেন সেটা আপনার আত্মীয়স্বজন বা বন্ধুবান্ধবের কারণেই করছেন। অর্থাৎ তারা যা বিশ্বাস করছে এবং যেভাবে বিশ্বাস করছে আপনি সেই একই বিষয় একইভাবে বিশ্বাস করছেন। আপনি যে একজন মুসলিম তার কারণ আপনার বাবা-মা বা আত্মীয়স্বজন সবাই মুসলিম। আপনি যদি কোনো মুসলিম পরিবারে জন্ম না নিয়ে কোনো হিন্দু, বৌদ্ধ বা খ্রিষ্টান পরিবারে জন্ম নিতেন, আপনি এরকমই প্রবল বিশ্বাসে বেদ, ত্রিপিটক কিংবা বাইবেলকে আঁকড়ে ধরতেন। অর্থাৎ ব্যাপারটা দাঁড়াচ্ছে এই যে আপনার চারপাশের মানুষজন যেভাবে ভাবছে বা বিশ্বাস করছে আপনি ঠিক সেইভাবেই ভাবছেন বা বিশ্বাস করছেন, আপনি বিষয়গততায় (objectivity) ডুবে আছেন। কিয়ের্কেগার্ড বলছেন যদি সত্যকে পেতে চান আপনাকে বিষয়ীগত (subjective) হতে হবে কারণ 'সত্য হচ্ছে বিষয়ীগততা'। আপনি বিষয়ীগত হোন। ধর্ম, সংস্কৃতি, মূল্যবোধ ইত্যাদির আবরণ সরিয়ে

আপনার অস্তিত্বকে নগ্ন করুন, মাথার ওপর থেকে প্রচলিত সব ধ্যান-ধারণা নামিয়ে রেখে আপনার অস্তিত্বকে লক্ষ করুন, তার মুখোমুখি দাঁড়ান, ভাবুন সেটা কোত্থেকে এসেছে, কেন এসেছে, এবং শেষ পর্যন্ত তা কোথায় যাবে। আপনি নিশ্চিতভাবেই ভয় পাবেন। ভয়ে শিউরে উঠবেন। কারণ আপনি দেখবেন নিদারুণ অনিশ্চয়তায় ভরা অনাদি অসীম খাঁ-খাঁ শূন্যতার কিনারায় নিরালম্ব ঝুলে আছেন আপনি। আতঙ্কে বিহ্বল হয়ে লক্ষ করবেন হতাশা গ্রাস করে নিচ্ছে আপনাকে। আপনি ধীরে ধীরে হতাশায় তলিয়ে যাবেন।

আপনার যদি সত্যিই এরকম অভিজ্ঞতা হয় তা হলে বুঝতে হবে আপনি আর ফিলিস্তিন নন। আপনার অস্তিত্বের নিদারুণ সংকটকে ভুলে থাকার জন্য এখন আপনি একজন aesthete কিংবা একজন নৈতিক মানুষে পরিণত হওয়ার কথা ভাবতে পারেন, অর্থাৎ ভোগসুখে ডুবে থেকে অথবা নিয়মনীতির কঠিন শৃঙ্খলে নিজেকে আবদ্ধ করে আপনি আপনার অস্তিত্বের নঞর্থতা (nothingness), অর্থহীনতা ও অনিশ্চয়তাকে ভুলে থাকার চেষ্টা করতে পারেন। ভুলে থাকতে পারলে বেশ তৃপ্তি নিয়ে বিভ্রমের মায়ায় বাকি জীবনটা কাটিয়ে দিতে পারবেন, আর যদি তা না পারেন আবার সেই ভয়াবহ হতাশার কবলে পড়ে যাবেন।

কিয়ের্কেগার্ড আপনাকে ভোগসুখ কিংবা জাগতিক নৈতিকতায় আশ্রয় নিতে নিষেধ করেন। তিনি বলেন, ভোগসুখ কিংবা নৈতিকতায় মগ্ন থেকে আপনি আপনার অস্তিত্বের নঞর্থতা, অর্থহীনতা ও অনিশ্চয়তাজনিত হতাশাকে ক্ষণিকের জন্য ভুলে থাকতে পারেন মাত্র, কিন্তু তাকে জয় করতে পারেন না*। হতাশাকে জয় করতে হলে আপনাকে মোক্ষলাভ করতে হবে।

এই মোক্ষলাভ কীভাবে সম্ভব? কিয়ের্কেগার্ড মনে করেন আপনার যদি ঈশ্বরে বিশ্বাস থাকে এবং আপনার ওপর যদি ঈশ্বরের করুণা বর্ষিত হয়, তা হলেই আপনি মোক্ষলাভ করতে পারেন। এখানে একটু লক্ষ করলেই বোঝা যায় সাধারণ ধর্মীয় নেতারা যে 'বিশ্বাস'-এর কথা বলেন এই 'বিশ্বাস' সেরকম নয়। কারণ এখন আর আপনি ফিলিস্তিন নন। ফিলিস্তিন থাকা অবস্থায় নিজের অস্তিত্ব সম্পর্কে অজ্ঞ থেকে, বিষয়গতভাবে ঈশ্বর-স্বর্গ-নরক ও ধর্ম সম্পর্কে পুরোপুরি নিশ্চিত হয়ে আপনার পক্ষে সেগুলো বিশ্বাস করা যত সহজ ছিল এখন আর তা নেই। এখন আপনি আপনার অস্তিত্বের স্বরূপ—তার নঞর্থতা, অর্থহীনতা ও অনিশ্চয়তাকে উপলব্ধি করেছেন, বিষয়ীগতভাবে চিন্তা করার ফলে ঈশ্বর, ধর্ম ও স্বর্গ-নরক সম্পর্কেও আপনি আর আগের মতো নিশ্চিত নন। এই পর্যায়ে এসে বিশ্বাস করা অনেক কঠিন। এই কঠিন কাজটি যদি আপনি করতে পারেন এবং আপনার ওপর যদি ঈশ্বরের করুণা বর্ষিত হয় তো আপনি ঈশ্বরকে পাবেন না হয় হারিয়ে যাবেন।

কিয়ের্কেগার্ড তাঁর বিভিন্ন লেখায় আমাদেরকে আমাদের অস্তিত্বের নঞর্থতা, অর্থহীনতা ও অনিশ্চয়তার মুখোমুখি হওয়ার উপদেশ দেন, নিঃসীম শূন্যতায় ভরা অতল খাদের

---

* এই প্রসঙ্গে John Bunyan-এর সেই বিখ্যাত ধর্মীয় allegory *The Pilgrim's Progress*-এর কথা আবার স্মরণ করা যাক। আগে আমরা লক্ষ করেছি Christian ও Pliable নামের দুটি চরিত্র কীভাবে হতাশার জলাভূমিতে (Slough of Despond) পড়ে গিয়েছিল। এই হতাশার জলাভূমি থেকে উঠে মোক্ষলাভের আশায় Christian যখন আবার অজানার উদ্দেশে তার যাত্রা শুরু করল তখন The Worldly Wiseman নামের একজন লোকের দেখা পেল সে। এই লোকটি Christian-কে বলল সে যদি তার পাপের বোঝা থেকে মুক্তি পেতে চায়, সে যদি মোক্ষলাভ করতে চায় তো তাকে Village of Morality-তে অবস্থিত House of Legality-তে যেতে হবে। The Worldly Wiseman-এর কথা শুনে, মোক্ষলাভ তো দূরের কথা, Christian-এর যে কী করুণ অবস্থা হয়েছিল তা বইটির পাঠকমাত্রই জানেন।

কিনারায় এনে সম্পূর্ণ অনিশ্চয়তার মধ্যে অটল বিশ্বাস নিয়ে ঈশ্বরের উদ্দেশে ঝাঁপ দেওয়ার জন্য প্রলুব্ধ করেন। অপরদিকে সাধারণ ধর্মতত্ত্ববিদ বা ধর্মীয় নেতারা ঈশ্বর ও ধর্ম সম্পর্কে আগেভাগে নিশ্চয়তা প্রদান করেন, তারপর তাকে বিশ্বাস করতে বলেন। তারা যে 'বিশ্বাস'-এর কথা বলেন, তা ফিলিস্তিনের বিশ্বাস—নিজের অস্তিত্বের নঞর্থতা, অর্থহীনতা ও অনিশ্চয়তা উপলব্ধি না করে; একঘেয়েমিতে, উদ্বেগে, অস্থিরতা বা হতাশায় না ভুগে; নিজের অবস্থান সম্পর্কে পুরোপুরি অজ্ঞ থেকে, পরাধীনভাবে কলের পুতুলের মতো বিশ্বাস। এখানেই সাধারণ ধর্মতত্ত্ববিদ ও ধর্মীয় নেতাদের সঙ্গে সোকির পার্থক্য। ধর্মকে দেখার, তথা মানুষের অস্তিত্বকে উপলব্ধি করার এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গি বিংশ শতাব্দীর অস্তিত্ববাদীদের প্রবলভাবে আকর্ষণ করেছে। তাঁর আস্তিক উত্তরসূরিরা অর্থাৎ আস্তিক অস্তিত্ববাদীরা, কার্ল ইয়েস্পার্স ও গ্যাবরেল মার্সেল প্রমুখ, তাঁর চোখ দিয়ে ধর্মকে দেখার চেষ্টা করেছেন; আর তাঁর নাস্তিক উত্তরসূরিরা অর্থাৎ নাস্তিক অস্তিত্ববাদীরা, জঁ-পল সার্ত্রর ও আলবের কামু প্রমুখ, ব্যক্তি-অস্তিত্বের স্বরূপ উন্মোচনে তাঁর কাছ থেকেই অনুপ্রেরণা লাভ করেছেন। এ জন্যেই তিনি অস্তিত্ববাদীদের 'পথ প্রদর্শক', তাঁদের 'গুরু', 'অস্তিত্ববাদের স্রষ্টা'।*

২

আমরা দেখেছি হেগেলের বিরুদ্ধে সোকির অন্যতম প্রধান অভিযোগ হচ্ছে এই যে, হেগেল সুরম্য প্রাসাদ নির্মাণ করেন ঠিকই—কিন্তু নিজে থাকেন পাশের গুদামঘরে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে এরকম অভিযোগ থেকে তিনি নিজেকেও রেহাই দেন নি। যেমন একজন আদর্শ খ্রিষ্টান হওয়ার জন্য যা-যা করা দরকার বলে তিনি বোধ করতেন, তাঁর মনে হয়েছিল, তিনি নিজেই তা করতে পারেন নি। এ কারণেই নিজেকে কখনো হিরো ভাবেন নি সোকি। তিনি জানতেন যে তিনি নেহাতই এক কবি। জীবনের শেষ প্রান্তে এসে মনে হয়েছিল, হয়তো তাঁর কবি-অস্তিত্বের কারণেই তিনি তাঁর লেখায় যে-সব কথা বলেছেন, বাস্তবে তা পালন করতে পারেন নি। কিন্তু খ্রিষ্টান হতে পারুন বা না-পারুন তিনি ঠিক করলেন যে তাঁর অবশিষ্ট কাব্যক্ষমতা তিনি খ্রিষ্টধর্মের বেদিতেই উৎসর্গ করবেন।

> আমি মূলত একজন কবি†..... এই প্রসঙ্গে একটি বিষয়ে আমি নিজেকে ছোট মনে না করে পারি না: বিষয়টি হচ্ছে আমি যেরকম বুঝি, নিজেকে সেরকম করতে পারি না .... একজন আদর্শ খ্রিষ্টপ্রেমিক হতে গিয়ে আমি বারংবার ব্যর্থ হই, তাই আমি তাঁর কবি হয়েছি.... কবির গানে যেমন তার নিজের ব্যর্থ প্রেমের দীর্ঘশ্বাস প্রতিধ্বনিত হয়, তেমনি খ্রিষ্টধর্ম সম্পর্কে আমার সব অত্যুৎসাহী আলোচনাতেও সেই একই দীর্ঘশ্বাস প্রতিধ্বনিত হয়: হায়, আমি সেরকম নই, আমি কেবল একজন খ্রিষ্টান কবি ও চিন্তাবিদ।[১]

এই সময়েই অর্থাৎ ১৮৪৭ থেকে ১৮৫০ সালের মধ্যে সোকি খ্রিষ্টধর্ম সম্পর্কিত তাঁর বিখ্যাত বইগুলো লিখেছেন। *The Works of Love* (১৮৪৭), *Christian Discourses* (১৮৪৮), *Two Minor Ethico-Religious Treatises* (১৮৪৯), *The Sickness Unto Death*

---

* এখানে উল্লেখ্য 'অস্তিত্ববাদ' শব্দটিও কিয়েৰ্কেগার্ডের কাছ থেকে পাওয়া।[২]

† কিয়েৰ্কেগার্ডের মূল লেখায় এখানে দিনেমার শব্দ 'dicter' ব্যবহার করা হয়েছে। কিন্তু 'dicter' ও 'poet' পুরোপুরি সমার্থক শব্দ নয়। কিয়েৰ্কেগার্ড কোনো কবিতা লেখেন নি কিন্তু তিনি ডেনমার্কের অন্যতম মহান কবিদের একজন।[৩]

(১৮৪৯) এবং *Training in Christianity* (১৮৫০) এই সময়কার লেখা। কিন্তু এত লেখালেখি করলেও ভেতরে ভেতরে কেমন দমে যাচ্ছিলেন তিনি, যেন ক্রমান্বয়ে জগৎ ও নিজের লেখক-সত্তা সম্পর্কে উৎসাহ হারিয়ে ফেলছিলেন। আবাল্যসঙ্গী সেই বিষণ্ণতা আবার ঘিরে ধরল তাঁকে। ১৮৫৩ সালে জার্নালে লিখেছেন : "দিনের পর দিন ক্লান্ত হয়ে পড়ছি আমি। লেখালেখির কাজকে প্রায় বাতুলতা মনে হয়। অন্যদিকে, না খেয়ে থাকলে নিজেকে খ্রিস্টান মনে হয়।"[৩] আরেক জায়গায় লিখেছেন, "যে কষ্টভোগকে খ্রিস্টধর্মের বৈশিষ্ট্য বলে মনে করা হয়, সেই কষ্ট আসে মানুষ থেকে"। ব্যাপারটা এরকম : খ্রিস্টধর্ম অনুযায়ী ঈশ্বরকে ভালবাসা মানে জগৎকে ঘৃণা করা।[৪] তিনি আরো লিখেছেন, "তা হলে মানুষকে ঘৃণা না করে ঈশ্বরকে ভালবাসা অসম্ভব।"[৫] শেষ পর্যন্ত বাবার সেই ধর্মীয় বিষণ্ণতা পুরোপুরি গ্রাস করে ফেলল তাঁকে। অন্যান্য লেখালেখি তো ছেড়ে দিলেনই, এমনকি জার্নাল লেখাও বন্ধ করে দিলেন। মনে হল সেই শক্তি-সামর্থ্য যেন অবশিষ্ট নেই আর, একেবারে ফুরিয়ে গেছেন তিনি।

কিন্তু হঠাৎ করে আবার জেগে উঠলেন। তাঁর বাবার বন্ধু ও উপদেষ্টা, জিলাণ্ডের (Zealand)* বিশপ এবং দিনেমার লুথারিয়ান চার্চের আর্চবিশপ (primate) বিশপ মিন্‌স্টার ১৮৫৪ সালে মৃত্যুবরণ করেন। এই সম্মানিত বিশপটি 'ধার্মিক' ছিলেন বটে তবে পার্থিব ভোগসুখও তাঁকে আকর্ষণ করত। অর্থাৎ অন্য অনেক ধর্মীয় নেতা বা সাধারণ মানুষের মতোই aesthetic ও নৈতিক (ethical) গুণাবলির সংমিশ্রণ ছিলেন তিনি। খুব ছোটবেলাতেই বিশপ মিন্‌স্টারের কাছাকাছি যাওয়ার সুযোগ হয়েছিল সোরেনের। বিশপ প্রায়ই তাঁদের বাড়িতে আসতেন, তর্কে-বিতর্কে মেতে উঠতেন, কখনো কখনো সোরেনও ঢুকে পড়তেন সেই আলোচনায়। বিশপের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা ছিল সোরেনের।÷ কিন্তু পরে বিশপের পার্থিব ভোগাসক্তি লক্ষ করে তাঁর প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ওঠেন তিনি। মিন্‌স্টারের শেষকৃত্যানুষ্ঠানে তাঁর উত্তরসূরি অধ্যাপক হান্স মার্টেনসন মিন্‌স্টারকে 'সত্যদ্রষ্টা' আখ্যা দেন। কিন্তু কিয়ের্কেগার্ড মনে করতেন যিশু নিজে যেরকম জীবন যাপন করে গেছেন বা যেরকম জীবন যাপন করার উপদেশ তিনি দিয়ে গেছেন, তা থেকে অনেক দূরে থেকে, জাগতিক আরাম-আয়েশ উপভোগ করে কারো পক্ষে সত্যদ্রষ্টা হওয়া সম্ভব নয়। সোকি খোলাখুলিভাবে এই মন্তব্যের প্রতিবাদ করেন। কয়েক সপ্তাহ পর মার্টেনসন যখন বিশপের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন, তিনি দৈনিক *Faedrelandet* (The Fatherland) পত্রিকায় 'খ্রিস্টান জগৎ'-এর বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণাত্মক কিছু লেখা লেখেন। তিনি লেখেন :

> একজন সত্যদ্রষ্টা হচ্ছেন তিনি, যিনি তাঁর নিজের অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে মানসিক দ্বন্দ্ব, ভয় ও কাঁপুনি, প্রলোভন, আত্মিক যন্ত্রণা, নৈতিক কষ্ট ইত্যাদিকে গভীরভাবে উপলব্ধি করেছেন। একজন সত্যদ্রষ্টা হচ্ছেন সেই ব্যক্তি যিনি দারিদ্র্য, অবমাননা, ঘৃণা, মনোমালিন্য, উপহাস, তাচ্ছিল্য, অবজ্ঞা ইত্যাদির মধ্যেও সত্যের পথে অবিচল থাকেন। একজন সত্যদ্রষ্টা হচ্ছেন একজন শহীদ।††[৬]

---

* Zealand হচ্ছে ডেনমার্কের খুব বড় একটি দ্বীপ। এই দ্বীপেই কোপেনহেগেন অবস্থিত।[৭]

÷ রেগিনকে ধর্মতত্ত্ব শেখানোর সময় সোকি প্রায় প্রতি সপ্তাহে মিন্‌স্টারের 'ধর্মোপদেশ' (sermon) থেকে পাঠ করে শোনাতেন।[৮]

†† এই সংজ্ঞাটি অনুসরণ করে 'সত্যদ্রষ্টা' খুঁজতে বেরোলে আমরা হয়তো ঘুরেফিরে কিয়ের্কেগার্ডের কাছেই হাজির হব। কারণ একজন সত্যদ্রষ্টার যেসব গুণ থাকা উচিত বলে তিনি উল্লেখ করেছেন, সেসব তাঁর নিজের চরিত্রে দুর্লভ নয়।

এই লেখাগুলো খুব আন্তরিকভাবে লিখেছেন সোকি, এবং তাঁর এইসব মতামত প্রকাশকে তিনি কর্তব্য মনে করতেন। শুধু দৈনিক *Faedrelandet* পত্রিকায় লিখেই ক্ষান্ত হন নি, নিজের বক্তব্য প্রচারের সুবিধার্থে *Øjeblikket* (The Instant) নামে নিজেই ছোট্ট একটি শিট (sheet) প্রকাশ করেন এবং "খ্রিষ্টান জগৎ" ও চার্চের দুর্নীতির বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করেন।

এই ঘটনাগুলো দিনেমার বিদ্বৎসমাজে যেমন তুমুল আলোড়ন তোলে, তেমনি সোকির জীবনেও এক বিরাট পরিবর্তন নিয়ে আসে। সেই বিধুর, বিহ্বল সোরেনকে আর চেনা যায় না। আজন্মলালিত বিষণ্ণতা ও চিন্তাচ্ছন্নতা ঝেড়ে ফেলে দিয়ে তিনি ধর্মযুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং সম্ভবত জীবনে এই প্রথম সত্যিকারের আনন্তর্য (immediacy) ও স্বতঃস্ফূর্ততার (spontaneity) অভিজ্ঞতা লাভ করেন। কিন্তু হঠাৎ এই পরিবর্তন সহ্য হয় না তাঁর, আর্থিক ও শারীরিকভাবে নিদারুণ ক্ষতিগ্রস্ত হন। এই সময় তিনি প্রায় কপর্দকশূন্য হয়ে পড়েন (তিনি অবশ্য বরাবরই বেহিসেবি ছিলেন) এবং অসুস্থ অবস্থায় ফ্রেডরিখ হাসপাতালে ভর্তি হন। এই হাসপাতাল থেকে আর বেরোতে পারেন নি। ১৮৫৫ সালে মাত্র ৪২ বছর বয়সে এখানেই মৃত্যুবরণ করেন তিনি। এভাবেই ধর্মের জন্য যুদ্ধ করতে করতে 'শহীদ' হয়ে যান। যে 'উৎসর্গে'র কথা বারংবার তাঁর বিভিন্ন বইতে লিখে গেছেন, শেষ পর্যন্ত নিজের ভেতর সেই 'উৎসর্গ'-কে প্রত্যক্ষ করেন।

সোরেন কিয়ের্কেগার্ডের শেষকৃত্যানুষ্ঠানে শোকবিহ্বল মানুষেরা ভিড় করে নি কিংবা দীর্ঘ শবযাত্রা করে শ্রদ্ধা জানানো হয় নি তাঁকে। কারণ তাঁর চিন্তাশক্তিকে উপলব্ধি করার মানসিক ক্ষমতা কিংবা পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতি তখনো গড়ে ওঠে নি, সে-সময় প্রায় অখ্যাতই ছিলেন তিনি। কিন্তু আজ তাঁর মৃত্যুর প্রায় দেড় শতাব্দী পর তিনি রীতিমতো জগদ্বিখ্যাত। এখন শিক্ষিত মানুষ মাত্রই জানেন আজকের অস্তিত্ববাদ ও প্রোটেস্ট্যাণ্ট ধর্মতত্ত্ব তাঁর কাছে কতটা ঋণী।

তথ্যসূত্র :

১. Hartshorne, M. Holmes, 1990, *Kierkegaard Godly Deceiver,* New York, Columbia University Press, p.4

২. Roubiczek, Paul, 1966, *Existentiatism for and against,* Cambridge, Cambridge University Press, p.10

৩. *Kierkegaard Godly Deceiver,* p.95

৪. Ibid., p.4

৫. Ibid., p.4

৬. Bhattacharya, Asoke, 1991, *Existentialism Kierkegaard Heidegger and Sartre,* Calcutta, p.46

৭. *Kierkegaard Godly Deceiver,* p.96

৮. *Existentialism Kierkegaard Heidegger and Sartre,* p.47

সোরেন কিয়ের্কেগার্ডের দার্শনিক ধারণাগুলো আসঞ্জনশীল নয়। লেখক হিসেবে তাঁর ক্যারিয়ার ছিল খুবই বর্ণিল; একেবারে আমূল পরিবর্তন না হলেও সময়ে সময়ে তার রূপ পাল্টেছে। ফলে তাঁর ধারণাগুলোকে একসূত্রে গাঁথা খুব কঠিন। এই বইয়ের মূল অংশে তাঁর দর্শনচিন্তা সম্পর্কিত আলোচনা শেষ করার পর মনে হচ্ছে অনেক কিছুই বাদ পড়ে গেছে। তা যাবে, কারণ সোকির বিচিত্র বিশাল রচনাবলিকে এই স্বল্প পরিসরে তুলে আনা আমার জন্য তো বটেই, যে কারও জন্য অসম্ভব। তবে এক্ষেত্রে আমার অক্ষমতা উল্লেখ্য, কারণ পরবর্তীকালে সোকির যেসব ধারণা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও প্রভাবশালী বলে বিবেচিত হয়েছে সেরকম অনেক বিষয় আমি মূল আলোচনার সঙ্গে মিশিয়ে উপস্থাপন করতে পারি নি। তাই এখানে বিচ্ছিন্নভাবে এবং সংক্ষিপ্ত আকারে সোকির সেরকম কিছু ধারণা বর্ণনা করার চেষ্টা করা হল।

উদ্বেগ

[উপর্যুক্ত 'উদ্বেগ' শব্দটি ইংরেজি anxiety শব্দের বঙ্গানুবাদ। কিন্তু কিয়ের্কেগার্ড ও অন্যান্য অস্তিত্ববাদীদের এই ধারণাটিকে প্রকাশ করার জন্য anxiety শব্দটি যথার্থ কি না এ বিষয়ে অনেকের সন্দেহ আছে। বিখ্যাত অস্তিত্ববাদীদের রচনাসমূহ ইংরেজিতে অনুবাদ করার সময় অনুবাদকরা একেক সময় একেক শব্দ ব্যবহার করেছেন। কিয়ের্কেগার্ডের প্রায় সব অনুবাদকই এক্ষেত্রে 'dread' শব্দটি ব্যবহার করেছেন[১]; WSP* থেকে ১৯৫৬ সালে প্রকাশিত Hazel E. Barnes কর্তৃক অনূদিত সার্ত্র্-এর *Being and Nothingness*-এ ব্যবহার করা হয়েছে anguish (সম্ভবত সার্ত্র্ ফরাসিতে angoisse ব্যবহার করেছিলেন বলেই এখানে anguish ব্যবহার করা হয়েছে); এবং anxiety শব্দটি মূলত মার্টিন হাইডেগারের অনুবাদকরা ব্যবহার করেন (হয়তো জার্মান angst শব্দটিকে মাথায় রেখেই ইংরেজিতে anxiety লেখা হয়)। এ প্রসঙ্গে হাইডেগারের *Being and Time*-এর ইংরেজ অনুবাদক J. Macquarrie ও E. S. Robinson পাদটীকায় লিখেছেন কোনো কোনো ক্ষেত্রে anxiety না লিখে uneasiness বা malaise লিখলে আরো যথাযথ হয়।[২] তবে এক্ষেত্রে সঠিক শব্দটি খুঁজে পাওয়া বেশ কঠিন, কারণ অস্তিত্ববাদীদের এই ধারণাটি এত সূক্ষ্ম যে চিন্তা বা শব্দ দিয়ে ধরতে গেলেই তা ফাঁক গলে বেরিয়ে যায়]

দর্শনের ইতিহাসে কিয়ের্কেগার্ডই সম্ভবত প্রথম দার্শনিক যিনি 'উদ্বেগ' নিয়ে মৌলিক ও বিস্তৃত আলোচনা করেছেন। হাইডেগারের মতে, "যে মানুষটি উদ্বেগের ধারণা নিয়ে সবচেয়ে বেশি বিশ্লেষণ করেছেন ... তিনি হচ্ছেন কিয়ের্কেগার্ড।"[৩]

কিয়ের্কেগার্ড তাঁর *The Concept of Dread* বইতে লিখেছেন উদ্বেগ মানে, "সহানুভূতিশীল বিদ্বেষ এবং বিদ্বেষমূলক সহানুভূতি।" তিনি বলেছেন : এ্যাডভেঞ্চারের প্রতি আকর্ষণ বোধ করে এমন একটি ছোট শিশুর কথা ভাবা যাক। ধরা যাক শিশুটির "রহস্যময়

Washington Square Press

ও অত্যদ্ভুত বিষয়ের প্রতি আকর্ষণ আছে।" শিশুটি অজানার প্রতি আকর্ষণ বোধ করে, আবার একই সঙ্গে বিষয়টিকে তার নিরাপত্তার প্রতি হুমকি মনে করে বলে তার প্রতি বীতস্পৃহ হয়ে ওঠে। কোনো কিছুর প্রতি স্পৃহা ও বীতস্পৃহা, সহানুভূতি ও বিদ্বেষ—একে অপরের সঙ্গে জড়িয়ে থাকে। এক্ষেত্রে শিশুটি ভয় পায় না, উদ্বেগে ভোগে। ভয় পওয়ার পেছনে কিছু নির্দিষ্ট বাস্তব বা কাল্পনিক বিষয়ের ভূমিকা থাকে, যেমন বিছানার নিচে সাপ কিংবা তেড়ে আসা ভিমরুল; কিন্তু উদ্বেগের কারণ সবসময়ই অজানা ও অনির্দিষ্ট। এবং অজানা ও অনির্দিষ্ট হওয়ার কারণেই কোনো বিষয়ের প্রতি একটি শিশু একই সঙ্গে স্পৃহা ও বীতস্পৃহা অনুভব করে।

ঐ একই বইতে পাপ সম্পর্কিত আলোচনাকালে উদ্বেগের প্রসঙ্গ এসেছে। পাপের কারণ সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি বাইবেলে বর্ণিত এ্যাডামের আদি পাপকে একটু ভিন্ন প্রেক্ষাপটে দেখেছেন। তিনি বলেছেন আমাদের প্রত্যেকেরই এ্যাডামের মতো অভিজ্ঞতা হয়, আমরা সবাই নিষ্পাপ অবস্থা থেকে পাপের দিকে অগ্রসর হই। আমাদের সবাইকেই আমাদের ভেতরে পূর্বনিহিত উদ্বেগের কারণে নিষ্পাপ অবস্থা থেকে পাপের দিকে অগ্রসর হতে হয়; আমাদের অন্তর্গত উদ্বেগ আমাদেরকে তাড়িত করে, আমরা পাপের প্রতি আকৃষ্ট হই। আমাদের ভেতরে অন্তর্নিহিত আদিম এই উদ্বেগকে সোকি তিন ভাবে বর্ণনা করেছেন।

(১) মানুষের নিষ্পাপ অবস্থাতেও উদ্বেগ থাকে, তবে সেটা নিষ্পাপতার আড়ালে লুকিয়ে থাকে। "নিষ্পাপতার গভীর গোপন কথা হচ্ছে এই যে এটা একই সঙ্গে উদ্বেগও বটে।"[৪] কিন্তু নিষ্পাপ থাকতে থাকতে এক সময় এক ধরনের স্থিতিহীনতা, অস্বস্তি কিংবা অমঙ্গলের আশঙ্কা অনুভূত হয়, ফলে পরম সুখময়তায় বিঘ্ন ঘটে। সোকি একটি নিষ্পাপ বালকের উদাহরণ দিয়ে বিষয়টিকে স্পষ্ট করেছেন। একজন নিষ্পাপ বালকের ভেতর যৌনানুভূতি জাগ্রত হলে সে অস্বস্তি বোধ করে কিংবা অস্থিরতায় ভোগে এবং তারপর যখন সে যৌনক্রিয়ায় লিপ্ত হয়ে নিষ্পাপতা হারায়, তার অস্তিত্বে একটি পরিবর্তন ঘটে যায়।

(২) উদ্বেগের ধারণাটি স্বাধীনতাবোধের সঙ্গেও জড়িত। বিষয়টিকে স্বাধীনতার dizziness (বিহ্বলতা) বা vertigo (খুব উঁচু জায়গা থেকে সোজা নিচের দিকে তাকালে মাথা ঝিমঝিম করা যে ভয়ের অনুভূতি হয় সেই অনুভূতি) হিসেবেও বর্ণনা করা যায়। কারণ স্বাধীনতা মানেই সম্ভাবনা, এবং সম্ভাবনার কিনারায় দাঁড়ানোর অনুভূতির সঙ্গে খুব খাড়া ও উঁচু কোনো জায়গার কিনারায় দাঁড়ানোর অভিজ্ঞতা মিলে যায়। John Macquarrie আরেকটি উপমা দিয়ে খুব চমৎকারভাবে এই বিষয়টিকে উপস্থাপন করেছেন। তিনি বলেছেন, মানুষের স্বাধীনতাবোধের গর্ভে থাকে সম্ভাবনা এবং এই গর্ভস্থ সম্ভাবনা নড়েচড়ে উঠলেই মানুষ উদ্বেগাক্রান্ত হয়।[৫]

(৩) মানুষ শরীর ও আত্মা নামক দুটি পরস্পর বিপরীত বিষয়ের সমষ্টি বলেই উদ্বেগ অনুভব করে। সে উদ্বেগ অনুভব করে কারণ সে তার শরীর ও আত্মাকে সংশ্লেষণ করতে চায়। পশুপাখি উদ্বেগে ভোগে না, কেননা তাদের জীবন পুরোপুরি ইন্দ্রিয়নির্ভর; একইভাবে একজন দেবদূতও কেবল কিছু বিশুদ্ধ বুদ্ধির সমষ্টি বলে উদ্বেগে আক্রান্ত হয় না।

একজন মানুষ হিসেবে আমাকে প্রতিনিয়ত আমার অনুভূতির সঙ্গে আমার যুক্তিকে মেলাতে হয়, আমার আত্মা ও শরীর যেন একে অপরের সঙ্গে সাযুজ্য রক্ষা করে চলে সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হয়, ফলে আমি উদ্বেগকে এড়াতে পারি না, "সে আমার হাত রাখে হাতে;/ সব কাজ তুচ্ছ হয়—পণ্ড মনে হয়,/ ...."[৬]

কিয়ের্কেগার্ড মনে করতেন মানব অস্তিত্বের গহিন কোণ থেকে শুরু করে সর্বত্র ছড়িয়ে

আছে এই উদ্বেগ। এক্ষেত্রে সোকি তথা অস্তিত্ববাদের সঙ্গে ইহুদিবাদ ও খ্রিষ্টধর্মের সাযুজ্য লক্ষণীয়। ইহুদি ও খ্রিষ্টধর্ম অনুযায়ী মানুষ আর কিছুই নয় কেবল স্বর্গ থেকে পতিত এক সত্তা মাত্র এবং সে বাস করে দুঃখ, কষ্ট, পাপ ও অপরাধের ভেতর। মানবজীবনের এই অমঙ্গলজনক ও তমসাচ্ছন্ন রূপ প্রত্যক্ষ করে সোকি ও অন্যান্য অস্তিত্ববাদীরা সুখ, এনলাইটেনমেন্টের আশাবাদ, ভালো থাকার অনুভূতি, স্টোয়িকবাদের নির্মল প্রশান্তি ইত্যাদি ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করেন; কারণ এসব ধারণা জীবনের উপরভাসা দিকগুলোকে তুলে ধরে বটে কিন্তু অত্যন্ত মূঢ়ের মতো হতাশাজনক ট্র্যাজিক দিকগুলোকে উপেক্ষা করে।[৭]

স্বাধীনতা

কিয়ের্কেগার্ড যদিও স্বাধীনতার ওপর খুব গুরুত্ব দিয়েছেন, কিন্তু এই বিষয়ে খুব একটা আলোচনা করেন নি। তাঁর মতে, অস্তিত্বশীল হওয়া মানেই স্বাধীন হওয়া। অন্য জায়গায় একটু অন্যভাবে লিখেছেন, আত্মসচেতন হলেই একজন মানুষ স্বাধীন হয়। তবে তাঁর লেখা পড়ে স্বাধীনতার কোনো পূর্ণাঙ্গ সংজ্ঞা বের করা খুব কঠিন। তিনি তাঁর *The Sickness Unto Death*-এ লিখেছেন :

> সসীমতা ও অসীমতা মিলে আত্মাকে (self) তৈরি করে। কিন্তু এই সংশ্লেষণটি হচ্ছে একটি সম্পর্ক এবং এটা এমন এক সম্পর্ক যা, যদিও এটা উদ্ভূত হয়, নিজেকে নিজের সঙ্গে সম্পর্কায়িত করে, যার অর্থ স্বাধীনতা। আত্মাই (self) স্বাধীনতা [Selvet er Frihed]। কিন্তু সম্ভাবনা ও প্রয়োজনীয়তা অর্থে স্বাধীনতা একটি দ্বান্দ্বিক উপাদান।

কিন্তু *Either/Or*-এর দ্বিতীয় ভল্যুমে, স্বাধীনতার ধারণাটি একটু অন্যভাবে উপস্থাপিত হয়েছে। সেখানে সোকি লিখেছেন :

> কিন্তু তা হলে আমার সত্তা কী : আমাকে যদি এর সংজ্ঞা দিতে হয়, আমার প্রথম উত্তর হবে : এটা সবচাইতে বিমূর্ত একটি বিষয়, কিন্তু তবুও একই সঙ্গে এটাই সবচাইতে মূর্ত—এটা স্বাধীনতা।

বোঝাই যাচ্ছে কিয়ের্কেগার্ডের স্বাধীনতা সম্পর্কিত ধারণাটি একটু জটিল। যাই হোক, এক্ষেত্রে জটিলতা এড়ানোর জন্য আমরা Louis Mackey-র সাহায্য নিতে পারি। তাঁর 'The Poetry of Inwardness' প্রবন্ধে সোকির স্বাধীনতা সম্পর্কিত ধারণাটি এভাবে উপস্থাপিত হয়েছে :

> It cannot be defined, derived, or demonstrated by a study of human nature, for definition, derivation, and demonstration are equivalent to determination, and a freedom determined by nature is a contradiction in terms. Presupposed in every human act, self-consciousness is necessarily inscrutable; it is always behind the thinker and within him, never wholly outside him or before him. Freedom can only be conceived via remotionis as the original undemonstrable source, the undefinable insubstantial essence, and the continuing self-initiating act of spirit.[৮]

স্বাধীনতা সম্পর্কে কিয়ের্কেগার্ডের এই ধারণা সম্ভবত সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয়

তাঁর নাস্তিক উত্তরসূরি সার্ত্র ও কাম্যুর মধ্যে। এঁদের লেখায় স্বাধীনতার ধারণা আরো বেশি গুরুত্ব পেয়েছে, কারণ, কিয়ের্কেগার্ডের মতো এঁদের কেউই ঈশ্বরের অধীন ছিলেন না। কিয়ের্কেগার্ডের মতো সার্ত্রও বলেছেন, মানব-অস্তিত্ব ও মানব-স্বাধীনতাকে আলাদা করা যায় না। সার্ত্রও মনে করতেন অস্তিত্বশীল হওয়া এবং স্বাধীন হওয়ার ঘটনা পরপর ঘটে না, কারণ একজন মানুষের মানুষ হওয়ার অর্থই স্বাধীন হওয়া।

ইতিহাস

ইতিহাস সম্পর্কে খুব একটা কিছু লিখে যান নি সোকি। আসলে ইতিহাসকে তেমন একটা গুরুত্বই দেন নি তিনি। তিনি অন্তত একাধিক বার বিভিন্ন জায়গায় বেশ স্পষ্ট উচ্চারণ করেছেন যে কোনো জাতির ইতিহাসের চেয়ে ব্যক্তিমানুষ সম্পর্কে তিনি বেশি উৎসাহী। কিন্তু তা সত্ত্বেও ইতিহাস সম্পর্কে তাঁর অন্তত দুটো ধারণা পরবর্তীকালের অস্তিত্ববাদীদেরকে প্রভাবিত করেছে।

সোকি মনে করতেন, ইতিহাস সব কিছুকে নিরপেক্ষ করে দেয়। ইতিহাসে যত মহান বা উল্লেখযোগ্য বিষয়ই থাকুক না কেন, তা নখদন্তহীন হয়ে পড়ে।

> ইতিহাস হচ্ছে একটি প্রক্রিয়া। খুব কদাচিৎ এক ফোঁটা আইডিয়া (idea) যুক্ত হয় এর সঙ্গে এবং সে তার নিজস্ব প্রক্রিয়ায় এই আইডিয়াকে একটি বাজে বকুনিতে পরিণত করে—যার জন্য কখনো কখনো কোটি কোটি মানুষ কিংবা শতাব্দীর পর শতাব্দী লেগে যায় (এবং এই সবকিছু করা হয়, যে আইডিয়াটি যুক্ত হয়েছে, সেই আইডিয়াটিকে বিশুদ্ধ করার অজুহাতে)।[৯]

কিয়ের্কেগার্ডের এই ধারণা ইতিহাস সম্পর্কিত হেগেলীয় সংজ্ঞার প্রায় বিপরীত।* হেগেলের প্রতিটি ধারণার বিরুদ্ধে লড়াই করার যে প্রবণতা সোকির মধ্যে লক্ষ করা যায়, এটা হয়তো তারই বহিঃপ্রকাশ।

সোকি তাঁর খ্রিষ্টীয় দৃষ্টিভঙ্গি থেকেও ইতিহাসকে বিচার করছেন। ইতিহাসের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা হচ্ছে ঈশ্বরের যিশুরূপে মর্ত্যে আগমন। এক অর্থে ইতিহাসে কেবল এই একটি ঘটনাই গুরুত্বপূর্ণ। তবে এটা ঠিক অতীতের ইতিহাস নয়, এটা হচ্ছে সমসাময়িক সত্য। সোকি তাঁর খুবই বিখ্যাত কয়টি লাইনে লিখেছেন, যিশুখ্রিস্টের সাক্ষাৎ শিষ্যরা তাঁর কাছাকাছি থাকতে পেরে যে সুযোগ পেয়েছিল, উনিশ শতাব্দী পরেও তাঁর বর্তমান শিষ্যরা সেই একই সুবিধা ভোগ করে। যদি [যিশুর] সমসাময়িক প্রজন্ম আর সব কিছু বাদ দিয়ে কেবল এই কথাগুলো রেখে যেত : "আমরা বিশ্বাস করেছি যে এই এই বছরে ঈশ্বর আমাদের মধ্যে একজন সামান্য ভৃত্য হিসেবে আবির্ভূত হয়েছিলেন, তিনি আমাদের মধ্যে বাস করে আমাদেরকে শিক্ষাদান করে গেছেন এবং শেষপর্যন্ত মৃত্যুবরণ করেছেন", তা হলেই যথেষ্ট ছিল।[১০] সোকির মতে এই ঘটনার কয়েক শতাব্দী পর খ্রিষ্টধর্ম এখন কেবল একটি ইতিহাসে পরিণত হয়েছে; আগে যা 'খ্রিষ্টধর্ম' ছিল, এখন তা 'খ্রিষ্টান জগৎ'-এ পরিণত হয়েছে, একটি অস্তিত্বশীল উদ্ধারকারী বাস্তবতা (saving reality) থেকে তা একটি যৌথ ঐতিহাসিক বিষয়ে রূপান্তরিত হয়েছে। খ্রিষ্টধর্মে সেই উদ্ধারকারী বাস্তবতার সব

---

* দ্বিতীয় অধ্যায়ে আমরা দেখেছি হেগেলের 'absolute mind' বা 'absolute spirit' বা 'ultimate reality' বা অনন্ত অসীম ঈশ্বর প্রতিটি ঐতিহাসিক কালপর্বে নিজেকে সসীমরূপে প্রকাশ করেন। ফলে হেগেলের দর্শনে ইতিহাস খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

ক্ষমতা এখন লুপ্তপ্রায়। এ সম্পর্কে কিয়ের্কেগার্ড তাঁর জার্নালে লিখেছেন :

> খ্রিষ্টের মাধ্যমে ঈশ্বর মানবজাতির সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মানুষ কী করল? তারা ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন না করে, যিশুরূপী ঈশ্বর কীভাবে তাঁর সাক্ষাৎ শিষ্যদের (apostles) সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলেন, কীভাবে তিনি মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করলেন— এইসব বিষয়কে ইতিহাস বানিয়ে ফেলল। পুরো ব্যাপারটাকে একটি গুরুত্বহীন ঐতিহাসিক বিষয়ে পরিণত করে তারা তা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মে পুনরাবৃত্তি করে চলল ....[১১]

অন্য মানুষ

কিয়ের্কেগার্ড মনে করতেন অন্য মানুষের উপস্থিতি ঈশ্বরের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপনে বাধা হয়ে দাঁড়াতে পারে। তিনি লিখেছেন, "অন্য মানুষের সঙ্গে মেলামেশা করার ব্যাপারে সবারই সতর্ক হওয়া উচিত এবং সবারই কেবল ঈশ্বর ও নিজের সঙ্গে কথা বলা উচিত।"[১২] এরকম চিন্তা করতেন বলেই হয়তো রেগিন-র সঙ্গে সম্পর্ক ভেঙে দিয়েছিলেন তিনি, হয়তো ভেবেছিলেন ঈশ্বরের পথে চলার ক্ষেত্রে রেগিন বাধা হয়ে দাঁড়াবেন। খুব স্বাভাবিকভাবে অন্যান্য ধর্মতত্ত্ববিদ ও দার্শনিক এ প্রসঙ্গে কিয়ের্কেগার্ডের তীব্র বিরোধিতা করেছেন। আমরা আমাদের সাধারণ বুদ্ধিতেও সোকির কথা মেনে নিতে পারি না।

কিন্তু এক্ষেত্রে সোকির সবচেয়ে বড় সমর্থক হচ্ছেন সার্ত্র্। তাঁর নাটক *No Exit*-এর সেই বিখ্যাত সংলাপ ("Hell is other people") আমাদের সবারই জানা। সার্ত্র্ সোকির মতো ঈশ্বরে বিশ্বাস করতেন না বটে, তবে মানুষ যে-পূর্ণতার দিকে ছোটে সেই পূর্ণতাকেই তিনি ঈশ্বর বলেছেন। মানুষ পূর্ণ হতে চায় অর্থাৎ সে ঈশ্বর হতে চায়। কিন্তু সে যখন দেখে যে তার মতো সবাই ঈশ্বর হতে চাচ্ছে, তখন সে অন্য মানুষদের প্রতিদ্বন্দ্বী মনে করে। এ কারণেই অন্য মানুষের উপস্থিতি তার কাছে অসহ্য বোধ হয়। এ কারণেই *No Exit*-এর চরিত্ররা, নারকীয় আগুন ছাড়াই, কেবল অন্য মানুষের উপস্থিতিতে নরকযন্ত্রণা ভোগ করে।

চিন্তা

কিয়ের্কেগার্ড এবং তাঁর অস্তিত্ববাদী অনুসারীরা 'চিন্তা'-কে একটু ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখেছেন। বহুদিন ধরে ভাবা হয়েছে যে চিন্তা ও বাস্তবতার মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। যেমন পার্মেনিদেস মনে করতেন যে চিন্তা ও সত্তা আসলে একই। চিন্তা সম্পর্কে এমত ধারণা সবচেয়ে প্রকট হয়ে ওঠে হেগেলের দর্শনে। তাঁর মতে, যা বাস্তব তাই যৌক্তিক। এর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করে উঠলেন সোকি। তিনি বললেন, চিন্তা ও বাস্তবতা এক নয়, চিন্তাজগৎ ও অস্তিত্বশীল বাস্তবজগতের মধ্যে দুস্তর ফারাক। বিমূর্ত চিন্তা সম্পর্কে কিয়ের্কেগার্ড লিখেছেন :

> বিমূর্ত চিন্তা হচ্ছে sub specie aeterni, এটা মূর্ত ও অস্থায়ী বিষয়কে উপেক্ষা করে, অস্তিত্ববাদী প্রক্রিয়াকে উপেক্ষা করে এবং অস্তিত্বে অবস্থিত স্থায়ী ও অস্থায়ী বিষয়ের সংশ্লেষণে যে ব্যক্তিসত্তা তৈরি হয়, সেই অস্তিত্বশীল ব্যক্তিসত্তার দুর্দশাকে অগ্রাহ্য করে।[১৩]

কিয়ের্কেগার্ডের সুস্পষ্ট অভিযোগ হচ্ছে— চিন্তা আমাদেরকে বাস্তবতা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেয়। তবে চিন্তাকে পুরোপুরি বর্জন করতে বলেন নি তিনি। এটা সত্যি যে সোকি, উনামুনো ও অন্যান্য অস্তিত্ববাদীদের এমন অনেক কথা আছে যা পড়লে মনে হয় চিন্তাকে

বর্জন করে অনুভূতি ও ইচ্ছাকে গুরুত্ব দেওয়া উচিত। কিন্তু সাধারণ অর্থে আমরা যাকে চিন্তা বলি, তাঁরা সেই চিন্তাকে বর্জন করতে বলেন নি, এক্ষেত্রে চিন্তা বলতে তারা আসলে বিমূর্ত চিন্তাকে বুঝিয়েছেন।

জনতা

কিয়ের্কেগার্ড 'জনতা'কে তেমন গুরুত্ব দেন নি। 'জনতা'র প্রতি কোনো সহানুভূতি ছিল না তাঁর। তাঁর মতে :

> 'জনতা'র ধারণাটাই অসত্য, কারণ এটা ব্যক্তিমানুষকে অনুতাপশূন্য ও দায়িত্বজ্ঞানহীন করে তোলে কিংবা তাকে একটি ভগ্নাংশে পরিণত করে কমপক্ষে তার দায়িত্বজ্ঞানকে দুর্বল করে ফেলে।*[১৪]

যদিও অনুতাপবোধ ও দায়িত্বজ্ঞানকে মাপা বা বিভাজন করা যায় না, কিন্তু 'জনতা'র ভেতর তা-ই করার চেষ্টা করা হয়; ফলে সেখানে ব্যক্তিসত্তা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। সম্মিলিত জনতা ব্যক্তির ওপর ভয়ঙ্কর প্রভাব বিস্তার করে। সোকি তাঁর *The Present Age, Literary Review*-তে লিখেছেন :

> সবকিছুকে এক পর্যায়ে আনতে হলে যে সর্বগ্রাসী কাল্পনিক প্রেতাত্মার মতো মরীচিকা সম সত্তাহীন দানবীয় শূন্যতার প্রয়োজন, তা-ই জনতা।

জনতাকে অনেকটা ফ্র্যাঙ্কেনস্টাইনের মতো ভয় পেতেন সোকি। তিনি বলেছেন :

> মানুষ যদি একবার এ্যারিস্টটল কথিত সেই multitude-এর (যা আসলে পশুদের বৈশিষ্ট্য) সঙ্গে একীভূত হওয়ার সুযোগ পায় (এক্ষেত্রে সবার চেয়ে শ্রেষ্ঠ হওয়ার পরিবর্তে সে সবচেয়ে নিকৃষ্ট ব্যক্তি মানুষটির চেয়েও নিকৃষ্ট হয়ে যাবে) তা হলে এই বিমূর্ত বিষয়টি কিছু একটা হবে এবং অল্প কিছুদিনের মধ্যেই সেটা ঈশ্বরে পরিণত হবে।[১৫]

সোকি হয়তো ঊনবিংশ শতাব্দীর সেইসব র‍্যাডিক্যাল দার্শনিকদের কথা মনে করেই এই কথাগুলো লিখেছিলেন যাঁরা ঈশ্বরকে একটি পৌরাণিক বিষয়ের চেয়ে বেশি কিছু মনে করতেন না।

কিয়ের্কেগার্ডের মতো নিট্‌শেও ব্যক্তির ওপর সমাজের অনপেক্ষ আধিপত্যের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। তিনি জনতাকে অবহেলাভরে 'পশুপাল' আখ্যা দিয়েছিলেন। তাঁর মতে এই 'পশুপাল' কিছু মূল্যবোধের মাধ্যমে মানবজাতির জীবন নিয়ন্ত্রণ করে।

জানা

কিয়ের্কেগার্ড মনে করতেন বিচ্ছিন্নভাবে বিশুদ্ধ চিন্তার মাধ্যমে কোনোকিছু জানা সম্ভব নয়। তাঁর মতে কোনোকিছু জানা মানে তা অনুভব করা। শুধু তিনি নন, তাঁর পর থেকে বার্দেইয়েভ (Bardyaev) পর্যন্ত সব অস্তিত্ববাদীরাই মনে করতেন জানা, অনুভব করা কিংবা

---

* 'A crowd—not this crowd or that, the crowd now living or the crowd long deceased, a crowd of humble people or of superior people, of rich or of poor, etc.—a crowd in its very concept is the untruth, by reason of the fact that it renders the individual completely inpenitent and irresponsible, or at least weakens his sense of responsibility by reducing it to a fraction.'— Kierkegaard

ইচ্ছা করার মধ্যে তেমন কোনো পার্থক্য নেই। তাঁদের মতে জ্ঞাতার সত্তা যদি জানার কাজে অংশগ্রহণ না করে, তা হলে জ্ঞাতার পক্ষে সত্যিকার অর্থে কোনোকিছু জানা সম্ভব নয়, অর্থাৎ জ্ঞাতব্য বিষয় থেকে নিজ সত্তাকে বিচ্ছিন্ন রেখে জ্ঞাতার পক্ষে তা জানা অসম্ভব। কিয়ের্কেগার্ড ও তাঁর অনুসারীদের মতে ঈশ্বরকে জানার অর্থ শুধু ঈশ্বর বলে কেউ একজন আছেন এটা জানা নয় কিংবা যুক্তির মাধ্যমে ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রমাণ সংগ্রহ নয়, তাঁদের মতে ঈশ্বরকে জানার অর্থ হচ্ছে বিশ্বাসের মাধ্যমে ঈশ্বরের সঙ্গে অনপেক্ষ সম্পর্ক স্থাপন করা। অস্তিত্ববাদীদের এই দৃষ্টিভঙ্গি ওল্ড টেস্টামেণ্টের সঙ্গে অনেকটা মিলে যায়। ওল্ড টেস্টামেণ্টে যখন লেখা হয়, "এখন এ্যাডাম তাঁর স্ত্রী ঈভকে জানলেন...." (Gen 4 : 1) তখন আসলে বোঝানো হয় যে এ্যাডাম তাঁর স্ত্রীর সঙ্গে যৌন সম্পর্ক স্থাপন করলেন। এখানে জানা মানে কেবল চিন্তার ভেতরে জ্ঞাতব্য বিষয়ের অস্তিত্ব অনুভব করা নয়, এখানে জানা মানে জ্ঞাতা ও জ্ঞাতব্য বিষয়ের মধ্যে শারীরিক সম্পর্ক স্থাপন।

তথ্যসূত্র :

১. Macquarrie, John, *Existentialism,* Pelican, p.165

২. Ibid., p. 165

৩. Heidegger, Martin, 1962, *Being and Time,* trans. J. Macquarrie and E. S. Robinson (New York and London) p. 227, n.1

৪. Kierkegaard, Søren, 1944, *The Concept of Dread,* trans. Walter Lowrie, Princeton, p.38

৫. Macquarrie, John, *Existentialism,* p. 165

৬. জীবনানন্দ দাশ, 'বোধ', পৃ. ২৮

৭. Lavine, T. Z., 1984, *From Socrates to Sartre,* New York, Bantam Books, p. 331

৮. Schrader, Jr. George Alfred (ed.), 1967, *Existential Philosophers : Kierkegaard to Merleau Ponty,* New York, McGraw-Hill Book Company, p. 81

৯. Kierkegaard, Søren, 1965, *The Last Years: Journals 1853-55,* ed. R. Gregor Smith, New York, Harper and Row, p. 151

১০. Kierkegaard, Søren, 1936, *Philosophical Fragments, or a Fragment of Philosophy,* trans. David F. Swenson, Princeton, Princeton University Press, p.42

১১. Kierkegaard, Søren, *The Last Years,* p. 143

১২. Macquarrie, John, *Existentialism,* p. 112

১৩. Kierkegaard, Søren, 1941, *Concluding Unscientific Postscript,* trans. D. F. Swenson, Princeton, Princeton University Press, p. 47

১৪. Kierkegaard, Søren, 1939, *The Point of View for My Work as an Author,* trans. Walter Lowrie, New York, p. 193

১৫. Kierkegaard, Søren, 1954, *The Sickness Unto Death,* published together with *Fear and Trembling* as *Fear and Trembling and The Sickness unto Death,* trans. Walter Lowrie, New York, p. 193

The Journals (1834-55)
From the Papers of One Still Living (1838)
The Concept of Irony (1841)
Edifying Discourses (1843-44)
Either/Or (1843)
Repetition (1843)
Fear and Trembling (1843)
Prefaces (1844)
Philosophical Fragments (1844)
The Concept of Dread (1844)
Three Discussions on Imagined Occasions (1845)
Stages on Life's Way (1845)
Concluding Unscientific Postscript (1846)
The Present Age (1846)
The Book on Adler (1846-47)
Edifying Discourses in Various Spirits (1847)
The Works of Love (1847)
Christian Discourses (1848)
Two Minor Ethico-Religious Treatises (1849)
The Sickness Unto Death (1849)
The Lilies of the Field and the Birds of the Air (1849)
The Point of View (1849)
The Individual (1849)
Training in Christianity (1850)
The Attack upon "Christendom" (1850)
For Self-Examination (1851)
Judge for Yourselves (1851-52)
This Must be Said; So Let it now be Said (1855)
God's Unchangeableness (1855)

গ্রন্থপঞ্জি

১. Auden W. H. (presented), 1971, *The Living Thoughts of Kierkegaard,* Bloomington and London, Indiana University Press.

২. Barry, Vincent, *Philosophy : A Text with Readings*, California, Wadsworth Publishing Company.

৩. Bhattacharya, Asoke, 1991, *Existentialism Kierkegaard Heidegger and Sartre,* Calcutta.

৪. Blackham, H. J., (rpt. 1994), *Six Existential Thinkers,* London and New York, Routledge.

৫. Brown, Colin, 1969, *Philosophy and the Christian Faith,* London, Tyndale Press.

৬. Christian, James L., *Philosophy : An Introduction to the Art of Wondering,* second edition.

৭. Copleston, Frederick, 1971, *A History of Philosophy, Vol. VII*, London, Search Press.

৮. Datta, Dhirendra Mohon, 1970, *The Chief Currents of Contemporary Philosophy,* Calcutta, Calcutta University Press.

৯. Dru, Alexander (select ed. and trans.) 1958, *The Journals of Søren Kierkegaard*, Fontana Paperback.

১০. Edwards, Paul and Pap, Arthur, 1973, *A Modern Introduction to Philosophy,* third edition, London, Collier Macmillan Publishers, New York, The Free Press, A Division of Macmillan Publishing Co.

১১. Feaver, J. Clayton and Horosz, William (ed.), 1971. *Religion in Philosophical and Cultural Prespective,* New Delhi, Affiliated East West Press Pvt. Ltd.

১২. Gould, James A., 1982, *Classic Philosophical Question,* fourth edition, London, Charles E. Merril Publishing Co.

১৩. Hartshorne, M. Holmes, 1990, *Kierkegaard Godly Deceiver,* New York, Columbia University Press.

১৪. Heidegger, Martin, 1962, *Being and Time,* trans. J. Macquarrie and E. S. Robnison.

১৫. Hollinger, Robert, Kline A. David and Klemke, E. D. 1986, *Philosophy The Basic Issues,* second edition, New York, St. Martin's Press.

১৬. Kaufmann, Walter, 1975, *Existentialism From Dostoevsky To Sartre,* A Meridian Book.

১৭. Kierkegaard, Søren, 1936, *Philosophical Fragments, or a Fragment of Philosophy,* trans. David F. Swenson, Princeton, Princeton University Press.

২৮. —1941, *Concluding Unscientific Postscript*, trans. David F. Swenson and Walter Lowrie, Princeton, Princeton University Press.
২৯. —1941, *Fear and Trembling*, Princeton.
৩০. —1944, *The Concept of Dread*, trans. Walter Lowrie, Princeton, Princeton University Press.
৩১. —1962, *The Point of View of My Work as an Author : A Report to History*, trans. Walter Lowrie, New York, Harper Torchbook.
৩২. —1965, *The Last Years : Journals 1853-55*, ed. R. Gregor Smith, New York, Harper and Row.
৩৩. Lavine, T. Z., 1989, *From Socrates to Sartre*, New York, Bantam Books.
৩৪. O'Connor, D. J. (ed.), 1964, *A Critical History of Western Philosophy*, New York, The Free Press, A Division of Macmillan Publishing Co.
৩৫. Peterfreund, Sheldon P. and Denise, Theodoree, 1967, *Contemporary Philosophy and Its Origins*, London, D. Van Nostrand Company.
৩৬. Reardon, Bernard M. G., 1966, *Religious Thought in the Nineteenth Century*, Cambridge, Cambridge University Press.
৩৭. Roubiczek, Paul, 1966, *Existentialism for and against*, Cambridge, Cambridge University Press.
৩৮. Saint-Exupéry, Antoine de, 1974, *The Little Prince*, trans. Katherine Woods, London, Piccolo Books in association with Heinemann.
৩৯. Sartre, Jean-Paul, 1956, *Being and Nothingness*, trans. Hazel, E. Barness, New York, Washington Square Press.
৪০. —*No Exit*
৪১. —*Search For A Method*, trans. Hazel E. Barnes.
৪২. Schrader Jr., Gorge Alfred, 1967, *Existential Philosophers : Kierkegaard to Merleau Ponty*, New York, McGraw-Hill Book Company.
৪৩. Smart, Ninian, 1969, *Philosophers and Religious Truth*, London, SCM Press Ltd.
৪৪. Tillich, Paul, 1965, *Systematic Theology, Vol. II*, Chicago, The University of Chicago Press.
৪৫. Wells, Stanley (ed.), 1983, *Shakespeare Survey, 36*, Cambridge, Cambridge University Press.
৪৬. *The New Encyclopaedia Britanica*, 15th edition, Vol. 17
৪৭. গোলাম ফারুক, ১৯৯৬, *প্লেটো : দর্শন ও রাষ্ট্রচিন্তা*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী
৪৮. নীরুকুমার চাকমা, ১৯৯৭, *অস্তিত্ববাদ ও ব্যক্তিস্বাধীনতা*, ঢাকা, বাংলা একাডেমী
৪৯. শৈলেশরঞ্জন ভট্টাচার্য, *অস্তিবাদের মর্মকথা*
৫০. সজীব ঘোষ (সম্পা:), ১৯৮৬, *অস্তিবাদ দর্শনে ও সাহিত্যে*, কলকাতা
৫১. সার্ত্র, জঁ-পল, ১৯৮৮, *শব্দ* (অনু. লোকনাথ ভট্টাচার্য), কলিকাতা, সাহিত্য অকাদেমি
৫২. হায়াৎ মামুদ, ১৩৯৮ (বাংলা), *মৎসকন্যা*, ঢাকা, গণপ্রকাশনী

নির্ঘণ্ট

অ

অগাস্টিন ৩৯
অতলান্ত গহ্বর এগার, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪৪, ৪৫, ৬৭
অনপেক্ষ (absolute) ২৩, ২৪, ৩৫, ৩৭, ৩৯, ৫৬
অনপেক্ষ নিশ্চয়তা (absolute certainty) ১৯
অনিশ্চয়তা দশ, ৪০, ৪৪, ৬৭
অন্য মানুষ ৭৫
অভিজ্ঞতাবাদী ৪৩
অর্থহীনতা ৬৭
অসীম ১৫, ৫৬, ৭৩
অস্তিত্ববাদ নয়, দশ, এগার, বার, ১৫, ৩৬, ৩৭, ৪৭, ৬৩, ৬৮, ৭০, ৭১, ৭৩, ৭৪

আ

আকার (Form) ২০
আধিবিদ্যক (metaphysical) দশ, ৩৪, ৩৮, ৩৯
আনন্তর্য (immediacy) ৭০
আন্তিগোনে ৫৬
আয়রনি (irony) ৫২
আলবের ক্যামু ৬৮, ৭৩

ই

ইওহানেস ক্লাইমেকাস বার, ৫
ইডিপাস ৫৬
ইতিহাস ১২, ৭৪, ৭৫
ইনিড ২৬
ইলিয়া ১৫
ইহুদিবাদ ৭৩

ঈ

ঈভ ৫৫, ৫৭, ৭৭
ঈশ্বর ৩, ১২, ২৩, ২৭, ২৮, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৫৭, ৫৮, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭

উ

উদ্বেগ নয়, ৪, ১৪, ২২, ২৫, ৩৫, ৩৮, ৬৮, ৭১, ৭২
উনামুনো ৭৫

এ

এডেন ৪৭
এ্যাডাম ৫৫, ৭২, ৭৭
এ্যাব্রাহাম ২১, ২৭, ৩২, ৩৫, ৩৭, ৩৮, ৩৯
এ্যারিস্টটল ৭৬

ও

ওল্ড টেস্টামেন্ট ৭৭

ক

কাণ্ট ১৪, ১৯, ২১
কার্ল ইয়েস্পার্স ৬৮
কোপেনহেগেন দশ, ১, ২, ৭, ৩১, ৩২
ক্যাটাগরি ৪৭, ৬০
ক্যালভিনিজম ৪৬

খ

খ্রিষ্টধর্ম এগার, ২, ৪, ৯, ১৬, ২২, ২৩, ২৭, ৩২, ৪০, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৬৮, ৬৯, ৭৩, ৭৪
খ্রিষ্টান এগার, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫৩, ৬২, ৬৪, ৬৮, ৬৯
খ্রিষ্টান জগৎ ৪৭, ৬৩, ৬৯, ৭৪

গ

গালাতিয় ৩৭
গালিলেও ৫২
গুহার রূপক ৫২
গৌতম বুদ্ধ ১১
গ্যাবরেল মার্সেল ৬৮

চ

চিদাত্ম (spirit) ১২, ১৩, ২১
চিন্তা ১৩, ২০, ২১, ২২, ৭৫, ৭৬

জ

জনতা ৭৬
জব ২১, ৩৫, ৩৬
জঁ-পল সার্ত্র নয়, ৬, ১১, ১৫, ৬৮, ৭১, ৭৩, ৭৪, ৭৫
জাজ উইলিয়াম ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৬০, ৬১
জাতি-রাষ্ট্র (nation-state) ৯, ১২

জানা ৭৬
জেনেসিস ৩৭
জ্ঞানের সিঁড়ি ৬৪

ড
ডেনমার্ক দশ, ১, ৭, ৯, ১১, ১৬
ডেভিড হিউম ৪৩

দ
দিনেমার নয়, বার, ১, ৭, ১০, ১৬, ৭০
দেকার্ত ১৩, ৩৫

ধ
ধর্মীয় স্তর এগার, ৫১, ৫৯
ধারণা (concept) ৬০

ন
নঞর্থতা (nothingness) ৩৮, ৪০, ৬৭, ৬৮
নিট্‌শে ৪০, ৭৬
নির্যাস (essence) ১৩, ১৪, ১৫, ২৫
নেপোলিয়ন ১, ২০
নৈতিক স্তর এগার, ২৮, ৫১, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬৪

প
পরমাত্মাবাদ ১০
পার্মেনিদেস ১৫, ৭৫
প্যারাডক্স এগার, ২১, ৩২, ৩৩, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪৪
পাস্কাল ১৯, ৩৫
প্রজ্ঞা ১৫, ৪৩, ৬৪,
প্রণালীবদ্ধ ১৪, ২৭
প্রত্যয় (concept) ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৯, ২০, ২১
প্রোটেস্ট্যান্ট ৭০
প্লেটো ১৩, ২০, ৫১, ৬৪

ফ
ফয়েরবাখ ১১
ফিলিস্তিন ৪৮, ৪৯, ৫১, ৫৩, ৫৫, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৬, ৬৮

ব
বাইবেল ২৭, ৩২, ৩৫, ৫৭, ৭২
বার্দেইয়েভ ৭৬
বিমূর্ত দশ, ১৪, ১৫, ২০, ৩৪, ৩৯, ৬৩
বিমূর্ত প্রত্যয় ১৯
বিশপ মিন্‌স্টার ৬, ৬৯
বিশ্বাস এগার, ৩৩, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৭, ৬৩, ৬৭,
বিষণ্ণতা নয়, ১৬, ৩১, ৭০
বিষয়গত ২০, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ৩৪, ৪৩, ৪৪, ৫৪, ৬৬, ৬৭
বিষয়গত সত্য (objective truth) দশ, ১০, ১৩, ১৭, ১৯,
বিষয়ীগত ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ৪৪, ৪৫, ৬৬, ৬৭
বিষয়ীগত সত্য (subjective truth) দশ, ১৯, ২১, ২২, ৪৩
বুদ্ধিবাদ ১৪
বুদ্ধিবাদী দার্শনিক দশ, ১০, ১৩, ১৭, ২১, ৩৪, ৪৩
ব্রুনো ৫২

ভ
ভানিনি ৫২
ভোগী এগার, ১৫, ২৮, ৫১, ৫৯

ম
মিকেইল পিডারসেন কিয়ের্কেগ বার, ২, ৩, ৫, ২৯
মোক্ষলাভ ৪৪, ৬৪, ৬৭

য
যিশুখ্রিষ্ট এগার, ৪৫, ৪৬, ৬২, ৬৪, ৭৪, ৭৫

র
রিপাবলিক (Republic) ৫২
রেগিন ওলসেন এগার, বার, ২৬, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৭৫

ল
লুথার ১৬, ৬৪
লুথারিয়ান চার্চ ৬৯
লেসিং ৪৫

শ
শাশ্বত ১৫, ৪৫, ৫৬, ৬৩
শাশ্বত সত্য ৪২
শেক্‌স্‌পীয়র ৩৮
শোপেনহাওয়ার ১০, ৪৬
শ্রীরামকৃষ্ণ ৩৪

স
সক্রেটিস এগার, ৭, ১৪, ৩১, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৫২, ৫৩, ৫৬, ৬২

সত্যদ্রষ্টা ৬৯
সত্তা ২০, ৭৩
সফোক্লেস ৫৬
সম্ভাবনা ৫৭
সসীম ১৫, ৭৩
সংখ্যায়ন (quantification) ১৪
সাংস্কৃতিক সমগ্রতা (cultural totality) ১২
সারধর্মবাদ ১০
স্টোয়িকবাদ ৭৩
স্পিরিট (spirit) ১২, ১৩, ৪৫
স্বাধীনতা ১১, ৫৬, ৭২, ৭৩, ৭৪

হ
হাইডেগার ৭১
হতাশা ৪০, ৫৭, ৬৭, ৬৮
হান্স ক্রিশ্চান আনেরসেন ৭
হান্স মার্টেনসন ৬, ৬৯
হেগেল দর্শ, ৭, ৯, ১০, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৯, ২১, ৩৪, ৪৩, ৬৮, ৭৪, ৭৫
হ্যামলেট ২৯, ৩৮

A
absolute mind, absolute spirit ১২, ৭৪
aesthete, aestheticism, aesthetics ২৮, ৪৯, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৭

C
Christian Discourses ৬৮
Concluding Unscientific Postscript ১০, ১৫, ৩৮, ৪২, ৪৩

D
Don Juan ২৭, ৫৯

E
Either / Or ১, ৪, ২৬, ২৭, ৩২, ৫৩, ৫৪, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬২, ৬৪, ৭৩

F
Fear and Trembling ৩২
Faust ২৭

G
Genesis, Gen ৭৭

J
Johannes Sløk ৪৮
Johannes The Seducer ৫৯, ৬০
John Bunyan ৪০, ৪৬, ৬৭

K
Kierkegards Univers ৪৮

L
Louis Mackey এগার, ২৬, ৫৭, ৫৯, ৭৩

P
Pastoral Seminarium ৩০
Pensées ৩৫
Philosophical Fragments ২০

R
Rasmus Nielsen ৩১
Repetition ৩২, ৩৫

S
Stages on Life's Way ৩২

T
The Concept of Dread ৩২, ৭১
The Fatherland ৬৯, ৭০
The Pilgrim's Progress ৪০, ৪৬, ৬৭
The Point of View for my work as an Author ৪৭, ৫৩
The Sickness Unto Death ৬২, ৬৮, ৭৩
The Works of Love ৬৮
Training in Christianity ৬৯
Two Minor Ethico-Religions Treatises ৬৮
The Present Age, Literary Review ৭৬

U
Ultimate reality ১২, ৭৪

W
Wandering Jew ২৭